জাহাজবাড়ির পরী

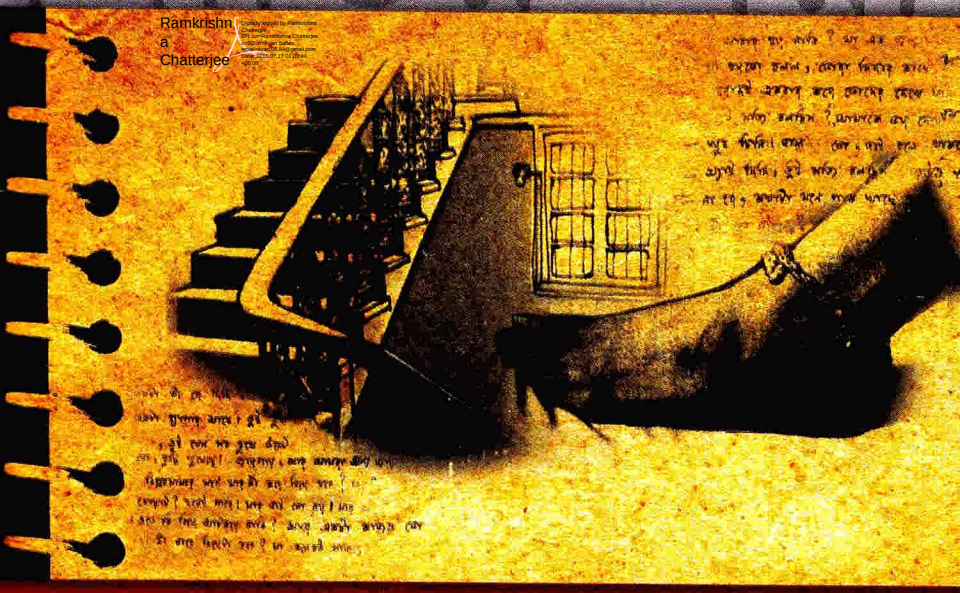

Ramkrishna Chatterjee
Digitized recently by Ramkrishna Chatterjee
Kolkata, West Bengal, India.
Email: ramkrishna.chatterjee.1948@gmail.com
Date: 2020-07-17 02:28:44
v2.0.20

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সূচি

জাহাজবাড়ির পরী ১
এলেবেলে ১৭
মূল্যবোধ ২৭
হিসেব মেলে না ৩৯
আপদ ৬১
তুতুল ৭০
অবগাহন ৮২
বৃষ্টি নামার পরে ৮৯
সমালোচক ১০০
কালোসুখ ১১০

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

জাহাজবাড়ির পরী

গোলাপি আসছে না দেখে নিজেই সকালের চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়েছিলাম। সবে পাতা ভিজিয়েছি, ডোরবেলের সুরেলা ঝংকার।

যাক, গোলাপিই।

অপ্রসন্ন মুখে বললাম, — তুই যে কী হচ্ছিস দিন দিন! বকুনিটা গোলাপি গায়েই মাখল না। চোখ ঘুরিয়ে বলল, — কী কাণ্ড গো বউদি, কী কাণ্ড! শুনেছ কী হয়েছে? বাহানা বানাচ্ছে! দেরি করে এলেই মেয়েটা আজব আজব গপ্পো ফাঁদে। গলা রুক্ষ করে বললাম, — কী হয়েছে? ঢাকুরিয়া স্টেশনে কোনো পাগল সার্কাস দেখাচ্ছে? নাকি মাতাল গড়াগড়ি খাচ্ছে? আর তাই দেখতে গিয়ে তোর...? — না গো, না। গোলাপি সুড়ুৎ করে ফ্ল্যাটের অন্দরে সেঁধিয়ে এলো,— এই মোড়ের মাথায় আজ জোর জটলা গো। জাহাজবাড়ির পরীদিদি নাকি কাল পালিয়েছে।

—যাহ্, কী আবোল-তাবোল বকছিস?

—মা কালীর দিব্যি। কাল বিকেলে দাসপাড়া বাজারে নাকি শব্জি কিনতে গেছিল, তারপর থেকে তার আর টেরেশ নেই।

আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কি!

পরীরা থাকে আমাদের মোড়ের হলুদ বাড়িটায়। পরীর বাবা ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, সেই সুবাদেই কী করে যেন নামটা চালু হয়ে গেছে

এলাকায়। দোতলা বাড়িখানায় বিন্দুমাত্র জাহাজের আদল নেই, তবুও। ক্যাপ্টেন সাহেব বহুকাল আগেই পরপারে, তাঁর স্ত্রীও গত হয়েছেন বছরছয়েক। ও বাড়ি এখন পুত্র-কন্যাদের অধিকারে। বড় ভাই, ছোট ভাই বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, মেজটি এখনো ধর্মের ষাঁড়। আর পরীর তো বিয়ের প্রশ্নই নেই। লেখাপড়া করেনি, দেখতেও তেমন সুবিধের নয়, মেঘে মেঘে বয়সও গড়িয়েছে বেশ। না হোক পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো হবেই। যথেষ্ট মুটিয়েওছে ইদানীং। তবে পরী ভারী মিশুকে টাইপ। এ-পাড়ায় আমরা এসেছি প্রায় বছরপাঁচেক, আমার সঙ্গে ভাবও হয়ে গেছে দিব্যি। প্রচুর বকবক করতে পারে মেয়েটা। বাড়িতেও চলে আসে হুটহাট, এ-বাড়ি ও-বাড়ির ঘোঁট শুনিয়ে যায়। নিজের বাড়িরও। একেবারেই সাদামাটা রহস্যহীন একটা মেয়ে। একটু-বা মাটোও।

সেই পরী কিনা আচমকা অন্তর্হিত? কেন?

প্রশ্নটা জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, গিলে নিলাম। গোলাপির সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনার কী দরকার! ঝি-চাকররা বাবুদের বাড়ির কেচ্ছা-কেলেংকারির গন্ধে ভারী আমোদিত হয়।

স্বভাবতই গোলাপিও রসে ফুটছে। আচার চাটার মতো করে বলল, — পরীদিদির মেজ ভাইটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী গাল পাড়ছে গো! বলছে, বজ্জাত মেয়েছেলে... আমাদের এভাবে আতান্তরে ফেলার কোনো মানে হয়? ফিরুক একবার হারামজাদি, মেরে যদি পাট না-করি তো আমি এক বাপের ব্যাটা নই।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, — মেজ মানে ওই গাঁট্টাগোঁট্টাটা? চুলে কদমছাঁট?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওই অলক্ষুণটা। লাট্টু। যে চিটিংবাজি করে বেড়ায়।

গোলাপি ভুল বলেনি। পাড়ায় ছেলেটার খুব বদনাম। একে ওকে তাকে টুপি পরানোই নাকি লাট্টুর পেশা। কাউকে জমি কিনিয়ে দেওয়ার নাম করে করপোরেশনের মাঠ দেখিয়ে নোট হাতাচ্ছে, তো কাউকে চাকরির টোপ

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে তার পকেট হালকা করছে। এই তো, একমাসও হয়নি, রাত এগারোটায় জাহাজবাড়ির সামনে কী হল্লাগুল্লা! চ্যাঁচামেচি শুনে সুপ্রকাশও বেরিয়ে গেল দেখতে। ফিরে এসে বলল, সেই পুরনো কিস্যা। ফোরটোয়েন্টি কেস। কাকে নাকি কোনো এক গ্যারেজের টয়োটা কোয়ালিস দেখিয়ে, মাত্র সত্তর হাজারে পাইয়ে দেবে বলে, আগাম দশ হাজার ঝেঁপেছিল। বারকয়েক চরকি খেয়ে লোকটা এবার চড়াও হয়েছে সদলবলে। তড়পাচ্ছে জোর। তবে কথায় আছে না, চোরের মায়ের বড় গলা! লাট্টু কুমারও খিস্তির বান ডাকাচ্ছে সমান তালে। দু'কান কাটা আর কাকে বলে।

তা এহেন গুণের গুণনিধি দাদাটি এখন বোনের ওপর গার্জেনি ফলাচ্ছে প্রকাশ্যে? বলব না, বলব না করেও বলে ফেললাম, — গলা ফাটিয়ে কী হবে? বোনের খোঁজখবর করেছে কোনো? হয়তো কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেছে।

—হাসালে বউদি। বেরোল বাজারের থলি নিয়ে, আর চলে গেল কুটুমবাড়ি?

—মনে কোনো রাগ-দুঃখ থাকলে যেতেই তো পারে। হয়তো ভাই, ভাইয়ের বউদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল!

—ঝগড়া তো জাহাজবাড়ির রোজকার ভজনকীর্তন গো বউদি। তাতে কি আর পরীদিদির গায়ে ফোসকা পড়বে?

—আরো কত কিছুই তো হতে পারে। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যাক্সিডেন্ট!

—দাসপাড়া বাজার এখান থেকে ক পা, গো? অ্যাক্সিডেন্ট হলে কেউ একটা খবর পেত না?

—তাহলে আর কি! যা, চা-টা ছেঁকে ফ্যাল।

বললাম বটে, তবু ভাবনাটা যেন লেপটে গেল মাথায়। পায়ে পায়ে সোফায় এসে বসলাম। সুপ্রকাশও উঠে পড়েছে, সেন্টার টেবিলে ঠ্যাং তুলে সে এখন খবরের কাগজে মগ্ন। প্রথমেই শেয়ারের পাতাটা খোলে সুপ্রকাশ,

সম্প্রতি কিছু টাকা রেখেছে মিউচুয়াল ফান্ডে, বাসিমুখে দেখে নেয় দর উঠল না পড়ল। আজ বোধহয় বাজার চড়েছে, সুপ্রকাশের মুখ বেশ আলোকিত। গোলাপি চা রেখে যাওয়া মাত্র চোখ থেকে নামাল কাগজ, ঠোঁটে কাপ ছোঁয়াচ্ছে আয়েশি মেজাজে।

সমাচারটা শোনানোর জন্য আমার পেট ফুলছিল। চায়ে একটা চুমুক দিয়েই বললাম, — এই জানো, পরীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

—কোন পরী? ভিক্টোরিয়ার?

—আরে না। আমাদের পাড়ার পরী। জাহাজবাড়ির পরী।

—অ। সেই লেংড়িটা?

—আহা, ওভাবে বলছ কেন! বেচারার পায়ের তলায় কড়া পড়ে গেছে, তাই একটু টেনে টেনে হাঁটে।

—নাকি ওইভাবে হাঁটে বলেই পায়ের তলায় কড়া পড়েছে?

—বাজে বোকো না তো। কথাটা শোনো। কাল সন্ধে থেকে পরীর আর খোঁজ নেই। বাজার করতে গিয়ে আর ফেরেনি।

—বাঁচা গেছে। অনেককাল আগেই ওর উড়ে যাওয়া উচিত ছিল। যা একখানা ফ্যামিলি, বাপ্‌স! এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়! মেজটির তো বোধহয় ইন্টারপোলে নাম উঠে গেছে। বড়টি একটি চালবাজ নাম্বার ওয়ান। আর ছোটটি তো রীতিমতো মিস্টিরিয়াস। আজ শুনি স্টোনের ব্যবসা করছে, তো কাল টয়ের! এই দিল্লি ছুটছে, এই মুম্বাই! আদৌ কিছু করে কিনা, করলেও কী করে, কোন পথে করে, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একটাই গুণ, ছোটটা বড়টার মতো বারফাট্টাই মারে না।

—হ্যাঁ, ছক্কার ব্যবহার ট্যবহার বেশ ভালো।

—ব্যবহার তো বড়রও ভালো। কী যেন নাম... হ্যাঁ, ভেকু। ভেকু একদিন আমাকে বলেছিল, ও নাকি একসময়ে রেসিং কার চালাত! কাররালির নেশা ছিল! এখন সেই মিস্টার ভেকু বাবুবাগানের এক বুড়ো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের লরঝরে ফিয়েট চালায়!

www.boiRboi.blogspot.com

—আহা, বিয়ে যা করেছে, যা হোক করে কিছু রোজগারপাতি তো করতে হবে। কলেজটাও তো ডিঙোতে পারেনি।

—কিন্তু ঢপবাজিতে তো পি এইচডি। বাকতাল্লার বহর শুনবে? সেদিন ব্যাটা ফিয়াটের ড্রাইভিং সিটে বসে কায়দা করে খইনি পিটছে... আমি দেখে জাস্ট একটু হেসেছি... ওমনি একটা ডায়ালগ ছেড়ে দিলো। শরীরে ব্লু ব্লাড বইছে তো দাদা, তাই বনেদি গাড়ি ছাড়া চালিয়ে সুখ পাই না! এ-গাড়ি দেখতে যেমনই হোক, খাঁটি ইটালিয়ান! সিক্সটি টুতে লোকার্নো র‍্যালিতে পার্টিসিপেট করেছিল!

—ওরা কিন্তু সত্যিই বনেদি বংশ। আদিসপ্তগ্রামের সান্যাল। বিখ্যাত পণ্ডিত হেরম্ব মৈত্র নাকি ওদের মা-র সম্পর্কে মামা হন। শিশির ভাদুড়ীও যেন ওদের কী রকম একটা দাদু।

—কে তোমায় এসব গপ্‌পো মারে, অ্যাঁ?

—পরীর মুখেই শুনেছি। ওদের নাকি এমন হীনদশা আগে ছিল না। পুরো সাহেবিকেতায় নাকি বড় হয়েছে পরীরা। দ্যাখো না, কেমন ইংরিজি বলে ফটর ফটর। ওর মা ছিলেন আর্মি অফিসারের মেয়ে। খুবই এটিকেট দুরস্ত। টেবিল ম্যানার্স থেকে শুরু করে প্রতিটি আদবকায়দা নাকি শিখিয়েছিলেন ছেলেমেয়েদের। নিজে এককালে ঘোড়ায় চড়তেন, গাড়ি ড্রাইভ করে পরীদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। ভাইজ্যাগে ওদের ফ্ল্যাটটাও নাকি ছিল ছবির মতো। জাহাজ থেকে রিটায়ার করার পর ওর বাবার মাথায় কী যে ভূত চাপল, কলকাতায় থিতু হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে পড়লেন।

—জানি, জানি। সুপ্রকাশ হাত তলে আমায় থামাল, — ওদের হিস্ট্রি এ পাড়ার সকলের জানা। ক্যাপ্টেন মশাই এখানে এসে বাড়ি বানালেন। একটা মেরিন ট্রেনিং স্কুল খোলার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ল, চিকিৎসা করতে করতে ফ্যামিলি পুরো ফৌত।... কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না ... এতই যদি ঘ্যামা পরিবার, ছেলেমেয়েগুলো এমন অশিক্ষিত, কুলাঙ্গার হয় কী করে!

ছক্কাটা বোধহয় কেঁদে ককিয়ে গ্র্যাজুয়েট, বাকিগুলো তো মনে হয় স্কুলও পেরোয়নি।

—পরী নাইন অব্দি পড়েছিল।

—এগোল না কেন?

—আহা, ফ্যামিলিতে অমন একটা বিপর্যয়...।

—ডোন্ট টক রাবিশ। ওর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ অবস্থায় অনেক ফ্যামিলিকে পড়তে হয়, তার পরেও ছেলেমেয়েরা ঠিক লেখাপড়া শিখে দাঁড়িয়ে যায়। ওই তো একটা আস্ত বাড়ি ছিল, ওটা বেচেই তো যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যেত। ছেলেগুলোই-বা ঢপবাজ চিটিংবাজ বনে গেল কেন?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, — কেন হলো?

—খোঁজো। কারণটা খোঁজো। দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং ইন দ্য ফ্যামিলি। মা নিশ্চয়ই লাই দিয়েছে ছেলেদের। অথবা কেয়ারলেস থেকেছে। মেয়ের ফিউচার নিয়েও তিনি সেভাবে ভাবেননি। কিংবা যেভাবে ভেবেছেন তার পরিণামেই পরীকে ওই অকালকুষ্মাণ্ড ভাইগুলোর সঙ্গে বাস করতে হচ্ছে। এখন হয়তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে মেয়েটা কোথাও ট্রেনের তলায় গলা দিতে গেল।

—ও কি অলক্ষুণে কথা! পরী মরবে কেন?

—মরলে বেঁচে যাবে। নইলে অনন্ত দাসীবৃত্তি ওর কপালে লেখা আছে। দেখেছ তো, ভাই, ভাইয়ের বউগুলো ওকে কী খাটান খাটায়। বাজারহাট, দোকানপাট, রান্নাবান্না, সব ওই মেয়ের ঘাড়ে। ছক্কার মেয়ের বেবিসিটিংও তো করতে হচ্ছে। ও যে কেন অ্যাদ্দিন পালায়নি, তাই তো আমার মাথায় ঢোকে না। রাস্তায় বসে ভিক্ষে করলেও অনেক সুখে থাকবে। কথাগুলো মানতে ইচ্ছে করছিল না, আবার প্রতিবাদও করতে পারছিলাম না। সুপ্রকাশ চলে গেল বাজারে। টুকিটাকি ঘরকন্নার ফাঁকে ফাকে পরীর কথাই ঘুরেফিরে

www.boiRboi.blogspot.com

আসছিল মনে। সত্যি তো মেয়েটার বিয়ে থা দেয়নি কেন? পরী অবশ্য বলে, মা তার বিয়ের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্বন্ধগুলো লাগেনি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? উঠেপড়ে লাগলে পরীর বিয়ে কি হতো না? এখন নয় পরী বেঢপ বনে গেছে, চিরকাল নিশ্চয়ই এরকম ছিল না। গায়ের রং তো মোটামুটি ফর্সা, বিশ বাইশ বছর বয়সে অবশ্যই খানিকটা লাবণ্যও ছিল। তবে কি পরীর মা চাননি পরীর বিয়ে হোক? খরচাপাতির কথা ভেবেই পিছিয়েছিলেন কি? নাকি মেয়ে চলে গেলে তাঁর খিদমতগারি করার আর কেউ থাকবে না বলে গুটিয়ে থাকতেন? এক সময়কার বেয়ারা বাবুর্চি দাসদাসী নিয়ে বাস করা অভ্যস্ত জীবনে একজন সর্বক্ষণের পরিচারিকা হিসেবে মেয়েকে ব্যবহার করে যাওয়াটাই কি তাঁর বাসনা ছিল? ভাই দাদারাও হয়তো সেই কারণেই পরীকে ঝিয়ের বেশি কিছু ভাবতে পারে না।

কিন্তু তাই-বা বলি কী করে? পরীর তো সংসারে ভালোই দাপট। গাধার মতো খাটে বটে, আবার ভাই ভাইয়ের বউদের তো দাবড়ায়ও। পরীর মাকেও স্বার্থপর ভাবাটা বোধহয় ঠিক নয়। ভদ্রমহিলাকে আমি দেখিনি, পরীর মুখে শুনেছি বর মারা যাওয়ার পর থেকেই ভদ্রমহিলা নাকি সুগার পেশেন্ট। শেষের দিকে বাতের ব্যথাতেও নাকি কষ্ট পেতেন খুব। যুবতী বয়সে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছিলেন, সেটাও নাকি পরে ভুগিয়েছে খুব। হয়তো-বা সেই কারণেই মেয়ের ওপর একটু বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ভ্যাগাবন্ড ছেলেরা মায়ের দেখভাল করবে, এ তো আর আশা করা যায় না। তাছাড়া পরীর সম্বন্ধগুলোও তো ভালো আসেনি। দোকানদার, পিওন, কোর্টের মুহুরি, কিংবা বউমরা আধবুড়ো স্কুলমাস্টার। এককালে যে-মহিলা হাইফাই সোসাইটিতে বিচরণ করেছেন, তিনি কী করে সজ্ঞানে ওই ধরনের পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দেন? যাই হোক, পরীর চিন্তায় মনটা কেমন মেঘলা হয়ে রইল দিনভর। সুপ্রকাশ অফিস থেকে ফেরার পর রাতেও খানিক গবেষণা হলো। তারপর উত্তেজনাটা আস্তে আস্তে থিতিয়েও গেল। সংসারে হাজারও কাজ, লক্ষ ঝামেলা, তার মধ্যে পাড়ার এক অকিঞ্চিৎকর মেয়ের কথা কদ্দিনই-বা মাথায় থাকে!

তবে গোলাপির কল্যাণে পরী মুছল না পুরোপুরি। গোলাপির নিজস্ব একটা নিউজ নেটওয়ার্ক আছে, সেইসব সাংবাদিকের অন্তর্তদন্ত আচ্ছা আচ্ছা চ্যানেলকেও ঘোল খাইয়ে দিতে পারে। তাদের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে পাতালেও বাস করা অসম্ভব।

মাসতিনেক পরে গোলাপিই বোমশেল ছাড়ল, হঠাৎই একদিন এসে বলল, — ও বউদি, পরীদিদির হদিস মিলেছে গো।

—তাই নাকি? কোথায়?

—সোনারপুরে। বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে।

—কার সঙ্গে?

—একটা লোক। সে নাকি পথেঘাটে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায়।

—যাহ্, তার সঙ্গে পরীর ভাব হবে কী করে?

—এই দুনিয়ায় কিছুই আজব নয় গো, বউদি। কার সঙ্গে কার কোথায় যে কখন মনের মিল হয়ে যায়, কে বলতে পারে! লোকটা নাকি দাসপাড়া বাজারে এসে মাঝে মাঝে ভেল্‌কি দেখাত। সেখানেই বুঝি চার চক্ষুর মিলন।

—তা পালালো কেন? বলেকয়েই তো যেতে পারত।

—হয়তো ভেবেছে ভাইরা আটকে দেবে। পরীদিদি না থাকলে তো জাহাজবাড়ি অচল। ওই তো, পরীদিদি পালিয়ে যাওয়ার পর দু-দুটো দিন ও বাড়িতে হাঁড়ি চড়েনি। বোনের শোকে নয় গো। তুই থুলি মুই থুলি করে। বড় বউ ভাবছে সে রান্না চাপালে পাকাপাকিভাবে তাকেই রাঁধুনি বনে যেতে হবে, ছোটবউও ভাবছে একবার হেঁশেলে ঢুকলে হেঁশেল বুঝি তার ঘাড়েই চাপল। ভেড়ুয়া বরদুটোও তাদের তালে তাল মেরে যাচ্ছে। আর মেজ তো ধর্মের ষাঁড়, তার তো বউ ছেলের বালাই নেই... সে বসে বসে বগল বাজাচ্ছে, আর দোকান থেকে রুটিতড়কা এনে ওদের সামনে গপাগপ সাঁটাচ্ছে। শেষমেষ বড়য় ছোটয় মিটিং করে ঠিক হলো, এক বউ সকালে ভাত রাঁধবে, অন্যজন রুটি সেঁকবে বিকেলের। তা রুটিতে তো খাটনি বেশি, তাই এ হপ্তায় যে রুটি, পরের হপ্তায় সে ভাত। আর মেজ অলম্বুশের

www.boiRboi.blogspot.com

ডিউটি শুধু সাবড়ে যাওয়া। খেতে না দিলে সে মেরেধরে কেড়েকুড়ে খেয়ে নেবে। শোনো না, আজকাল কী ক্যাচম্যাচ বাধে ও বাড়িতে?

শুনি বটে। কানে আসে মাঝে মাঝে। রাত বাড়লেই ভাইয়ে ভাইয়ে গানবাজনা শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে বউদের দোহারকি। তা সে তো আগেও হতো। পরী থাকতেই। গোটা পাড়া নিঝুম হলে জাহাজবাড়ি জেগে ওঠে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, — তুৎ, ও বাড়ির পাঁচালি কে শুনতে চায়! পরীর কথা বল। সে এখন আছে কেমন?

—বর পেয়েছে, ঘর পেয়েছে, আমোদেই আছে নিশ্চয়ই।

—তা তুই তো থাকিস তালদিতে। তুই খবর পেলি কি করে?

—সোনারপুর মাড়িয়েই আসা-যাওয়া করতে হয় গো, বউদি। আমাদের ক্যানিংয়ের গাড়িতেও সোনারপুরের বাতাস ঢুকে পড়ে। দোক্তা খাওয়া দাঁত ছড়িয়ে হাসল গোলাপি। চোখ টিপে বলল, — সোনারপুর থেকে কত মেয়ে ঢাকুরেতে কাজ করতে আসে। কেউ একজন জানতে পারলে, গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ!

—পরীর ভাইরা খবর পেয়েছে?

—নিশ্চয়ই। বিমলা তো বলছিল লাট্টুকে নাকি দেখেছে সোনারপুরে। সে নাকি প্রায়ই পরীদিদির বাড়ি যায়।

—আশ্চর্য, পাড়ায় কেউ জানে না তো!

—চেপে রেখেছে। বিয়ে হোক আর যাই হোক, তোমাদের মতো ঘরের এটা কেচ্ছা তো বটে।

মনে মনে হাসলাম। ভেকু লাট্টু ছক্কারা তাদের ঘরের খবর যেন কত গোপন রাখে! ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জব্বর একখানা গুল ফাঁদতে পারছে না বলে কথাটা এখনো চাউর করেনি বোধহয়। যখন করবে, কমসমের ওপর দিয়ে যাবে না নির্ঘাত। হুডিনির বংশধর না বলুক, পরীর বরকে পি সি সরকারের ভাইপো ভাগ্নে না কিছু বানিয়ে দেয়।

যাক গে যাক, পরীর একটা হিল্লে তো হলো। মেয়েটার যা শিক্ষাদীক্ষা, রূপ, বয়স... রাস্তার ম্যাজিশিয়ানই-বা মন্দ কী! বেচারা এখন সুখে থাকলেই শান্তি।

ঐন্দ্রজালিক সুখ অবশ্য বেশিদিন সইল না পরীর। বছর ঘুরতে না ঘুরতে হঠাৎ একদিন পরী ব্যাক। লটবহর নিয়ে নয়, পেটে একটা বাচ্চা নিয়ে। সুপ্রকাশই মোড়ের চায়ের দোকান থেকে নিয়ে এসেছিল বারতাটি। পরীর সেই ম্যাজিশিয়ান বর নাকি খেলা দেখাতে বনগাঁ না বসিরহাট কোথায় গিয়েছিল, তারপর থেকে সে নিজেই ভ্যানিশ। অপেক্ষা করে করে, করে করে, অগত্যা ফিরে এসেছে পরী।

শুনে তো আমার মাথায় হাত। বললাম, — সর্বনাশ, আবার ওই বাড়িতে? পরীর ভাইদের কী রিঅ্যাকশান?

—ভেকু আর লাট্টু তো মোড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে ডুয়েট গাইছে। ভেকু বলছে, হারামির বাচ্চা তুই সান্যালবাড়ির মর্ম বুঝলি না! জানিস, এখনো আদিসপ্তগ্রামের বাড়ির পুজোয় আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সাতশো লোকের পাত পড়ে! আর লাট্টু বলছে, আমার বোনের সঙ্গে বেইমানি আমি ছুটিয়ে দেবো! ও শালার দেখা পাই একবার... পেছনে গ্রেহাউন্ড লেলিয়ে দেবো! ও শালাকে খুন করে যদি ফাঁসি না যাই, তো আমি সাতপুরুষের বেজন্মা!

সাতপুরুষের বেজন্মাটা কী, আমার বোধগম্য হলো না। আর সাতশো লোকের পাত পড়ার মতো চণ্ডীমণ্ডপটা কত বিশাল হতে পারে তাও কল্পনা করতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম বোনের এই অপমানে দাদারা অতিশয় মর্মাহত। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হলাম, যাক জাহাজবাড়িতে পরীর আবার থাকা নিয়ে অন্তত সমস্যা হবে না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে হঠাৎ পরী স্বয়ং এসে হাজির। দুপুরবেলা। সেই একই ভঙ্গিতে। দুলে দুলে। মুখে কোনো দুঃখের ছায়া নেই। বরং আগের মতোই একটা নির্বোধ হাসির টুকরো ঝুলে আছে।

ডাকলাম, — আয়, আয়। কদ্দিন পরে দেখছি, তোকে একটু ভালো করে দেখি।

www.boiRboi.blogspot.com

একটু যেন লজ্জা পেল পরী। বলল, — দূর, আমাকে কী দেখার আছে!

—বা রে, তুই কত বদলে গেছিস! হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর...! বলতে বলতে ফোলা পেটটার দিকে আঙুল দেখালাম, — এটাও তো নতুন।

পরী হেসে ফেলল, — পেটটা বড্ড বেড়ে গেছে গো।

—ক'মাস চলছে?

—পাঁচ। পরশু থেকে হেভি নড়ছে।

শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলাম পরীকে। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসল পরী, দু-পা ছড়িয়ে দিলো সামনে। তিনতলায় উঠে হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

পরীকে একগ্লাস জল এনে দিয়ে আমিও বসেছি সামনে। জিজ্ঞেস করলাম, —তারপর বল... কী খবর তোর?

—শুনেছ তো। পরী হাত উলটোল, — পার্টি ভেগে গেছে।

পরীর কথা বলার ধরনধারণও বদলায়নি এতটুকু। হেসে ফেলে বললাম, —ও কী বলার ছিরি! নিজের বরের সম্পর্কে ওভাবে বলতে আছে নাকি?

—বর না ঘেঁচু। ও তো একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মাল।

—মানে?

—ওর তো আগেই বিয়ে হয়েছে। বউ বাচ্চা আছে। হৃদয়পুরে।

—বলিস কী রে? আগের বিয়ে লুকিয়ে...?

—না না, লুকোছাপার বিজনেস নেই। আমাকে আগেই বলে দিয়েছিল, দুনম্বর হয়ে থাকতে হবে। হৃদয়পুরের বউও আমার কথা জানে।

—কী কাণ্ড! তার মানে জেনেশুনে তুই...?

—কী করব বউদি, উই ওয়্যার ইন লাভ।

—লাভটা হলো কী করে? ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক দেখে?

—তুৎ, ও আবার ম্যাজিশিয়ান নাকি? জানে তো মাত্র ছখানা কার্ডগেম। পামিং, পাসিং। আসল কাজ তো ওর ব্যথা বেদনার তেল বেচা। হাতের

কয়েকটা কেরদানি দেখিয়ে কাস্টমার জড়ো করে। তবে আজকাল ওই ট্যাকটিস্ কলকাতায় বেশি চলছে না। রোজগারের ধান্ধায় গ্রামেগঞ্জে ঘুরতে হয়।

—তার মানে জাদুকরও নয়? কী দেখে তাহলে লোকটাকে পছন্দ করেছিলি?

—খুব স্মার্ট গো। বিউটিফুল কথা বলে।

—তাতেই তুই গলে জল? ...কাউকে কিছু না জানিয়ে... ঘরবাড়ি ছেড়ে...?

—বললে এরা আমায় যেতে দিত নাকি? আমি না থাকলে সান্যালগুষ্টীকে সামলাবে কে? বউ-দুটোকে কে গ্রিপে রাখবে? এসে তো দেখছি বাবুদের কী হাল! বড়দা আর ছক্কা পালা করে কুটনো কুটছে। হি-হি। বউদি হাঁকল, ভাতের ফ্যানটা গেলে দিয়ে যাও তো... ওমনি রাজার ব্যাটা পড়িমরি করে হাঁড়ি উলটোতে ছুটল! বউয়ের হুকুমে ছক্কাবাবু উবু হয়ে বসে আটা মাখছে, কী সিন! হি-হি হি-হি।

—হাসিস না। থাম। তোর প্রাণে এখনো এত ফুর্তি? বর তোকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও?

—গেছে তো গেছে। দুঃখ পাওয়ার কী আছে!

—গেল কেন? তোর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

—না। ...ওর শালাটা একটা সোয়াইন। ওর নামে কেস ঠুকে দিয়েছে। একসঙ্গে দুটো বিয়ে তো বেআইনি। তাও টাকাপয়সা দিয়ে ম্যানেজ করতে চেয়েছিল, হারামি শালাটা রাজি হলো না।

—তবে যে তুই বললি, আগের বউয়ের মত ছিল?

—মত ছিল বলিনি তো। জানত। ব্যাকডেটেড উওম্যান, মন থেকে মানতে পারেনি। তা এবার যাওয়ার সময়ে আমায় হাজার টাকা হাতে দিয়ে বলে গেছিল, এক মাস অপেক্ষা কোরো। এর মধ্যে ফিরলাম তো ফিরলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

নইলে আমার আসা হলো না। আমিও ওয়েট করিনি। এ মাসের ভাড়াটা না দিয়েই কেটে এসেছি।

একের পর বিস্ফোরক তথ্য পরিবেশন করছে পরী। আমি শিহরিত হচ্ছিলাম। থতমত মুখে জিজ্ঞেস করলাম, — তাহলে যে শুনছিলাম... তোর বর কোথায় যেন ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে...?

—ওটা আমার স্টোরি। দাদারা কাঁউমাউ করছিল... লোককে কী বলব...! তাই আমি ওটা সাজিয়ে দিলাম। তোমরা কি ভাবছ আমায় দেখে ওরা শক্‌ড? বুলশিট্। সকলে দুহাত তুলে নাচছে। বউরাও। ছক্কার বউ তো সঙ্গে সঙ্গে গুটলিকে আমার পায়ে লেলিয়ে দিলো। সে ছুড়িও পিসি পিসি করে অস্থির। খুব ওস্তাদ হয়েছে কিন্তু গুটলিটা।

অজান্তেই ছোট শ্বাস পড়ল আমার। বললাম,

—তাহলে জোয়াল ফের তোর কাঁধে চাপল?

—নিতে তো হবেই। পরীর নির্বিকার জবাব,

—বড়দা আমার হাত ধরে বলল, ডেলিভারিটা করে নিয়েই সংসারটাকে আবার কড়া হাতে ধর। আমরা কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছি রে! আশ্চর্য, কোনো হাহাকার নেই, বেদনাবোধ নেই, বোনকে ভাইরা স্রেফ ব্যবহার করছে, সেটাও বোঝে না। এ কি নাড়ির টান? নাকি মেয়েটার মগজ একেবারেই ঘিলুহীন?

একটু বাঁকা সুরেই বললাম, — তা নয় হলো। ভাইদের সংসারেই না হয় জীবনপাত করলি। কিন্তু যে-বাচ্চাটা আসছে, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিস? তাকে তো মানুষ করতে হবে। ভাইরা সে-খরচ দেবে?

—ওরা কোথ্‌থেকে দেবে? তিনটেই তো ভুখ্‌খা পার্টি।

—তাহলে? তোর বরের কাছে খরচা চাইবি?

—তার আর টিকি দেখা গেলে তো। পরী নড়েচড়ে বসল, — ব্যবস্থা একটা হচ্ছে। চার ভাইবোনে কাল বসেছিলাম। প্রোমোটার ফিট করে বাড়িটা

তার হাতে দিয়ে দেবো। জমি তো কম নেই, সামনে পেছনের ফাঁকা জায়গা মিলিয়ে প্রায় ছ কাঠা। আমরা চারজন চারটে ফ্ল্যাট নেব। সঙ্গে ক্যাশ যদি কিছু পাই তো ক্যাশ। মেজদা বিয়েশাদি করছে না... ওই চিটিংবাজকে কেই-বা মালা পরাবে... ওর ফ্ল্যাটেই থাকব আমরা দুজনে। আর আমারটায় ভাড়া বসিয়ে দেবো। ভাড়ার টাকায় মামা ভাগ্নেকে টেনে দিতে পারব না?

প্ল্যানটা অবশ্য মন্দ নয়। ঠাট্টার সুরে বললাম,

—বাহ্, তুই তো বেশ চালু হয়েছিস!

—হতেই হবে। এখন মা হতে যাচ্ছি না! ছেলেই হোক, কী মেয়ে, তাকে মানুষ করার দায়িত্বও তো আমার। বলতে বলতে পরী হাত বোলাচ্ছে পেটে, —আচ্ছা বউদি, ডেলিভারিটা নরমাল হওয়াই তো ভালো, কী বলো? সিজার মানেই তো গুচ্ছের টাকার ধাক্কা। ডাক্তাররা চুষে নেবে।

হেসে ফেললাম, — দ্যাখ কী হয়। তার আগে সামনের চারটে মাস তো কাটা।

চার মাস নয়, আড়াই মাসের মাথায় প্রসব করল পরী। মরা বাচ্চা। অনেক আগেই পেটে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নড়াচড়া, পরী বুঝতে পারেনি। ভাগ্যিস, সময়মতো ধরেছে ডাক্তার, নইলে প্রাণসংশয় হতো পরীর।

গোলাপির মুখে খবরটা পেয়ে খুব খারাপ লেগেছিল। আহা রে, মেয়েটা কি একটা কিছুও পেতে পারে না? বিধাতা বলে যদি কেউ থেকেও থাকেন, তিনি এত নিষ্ঠুর কেন? নিয়তিদেবী কি চিরকাল মেয়েটাকে নিয়ে শুধু খেলবে?

পরী হাসপাতাল থেকে ফেরার পর একদিন গেলাম দেখতে। বেশ কাহিল হয়ে গেছে বেচারা। চোখের নিচে কালি, ফ্যাকাশে গাত্রবর্ণ বলে দেয় রক্তাল্পতায় ভুগছে।

আমাকে দেখে শুকনো মুখে হাসল পরী। বলল, — বসো বউদি। আমার তো রোগব্যাধি হয় না, কেউ তাই আমাকে দেখতেও আসে না। তুমি এলে, বড় আনন্দ হলো।

www.boiRboi.blogspot.com

পরীর হাতটা ধরলাম। ঠান্ডা। নিয়মমাফিক সান্ত্বনার সুরে বললাম,

—ভেঙে পড়িস না। যা হলো, তা হয়তো তোর মঙ্গলের জন্যেই হলো।

—তাই হবে। ব্যাটা জোর বেঁচে গেল। দুনিয়ায় একবার এনট্রি নিয়ে নিলে কোন চক্করে পড়ত তার ঠিক আছে?

এবারও পরীর স্বর নিতান্তই সহজ। কিন্তু আমার যে কেন কান্না পাচ্ছিল? দুটো চারটে কথা বলেই উঠে পড়লাম। কেন যেন মনে হচ্ছিল, পরী ভেতর থেকে চিড় খেয়ে গেছে, তবু প্রকাশ করছে না।

মাস তিন চার পরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমি তো জাহাজবাড়ি যাইই না, পরীও আসে না। গোলাপি চ্যানেলের নিউজ, পরী নাকি সুস্থ হয়ে আবার লেগে পড়েছে গৃহকর্মে। রাঁধছে, বাড়ছে, ভাই, ভাইয়ের বউদের সঙ্গে ঝগড়া করছে...। তবে বেরোয় না বড় একটা। বাজার টাজারও সম্ভবত ভাইরাই করে। কিংবা তাদের বউরা। হঠাৎই একদিন ঢাকুরিয়া লেভেল ক্রসিংয়ে পরীর মুখোমুখি। যথারীতি গোড়ালি থেকে এক হাত উঁচুতে শাড়ি, এলোমেলো কুঁচি পেটের কাছে ফুলে আছে, সিঁথিতে ঠাট্টার মতো সিঁদুরের রেখা, হাতে একখানা প্লাস্টিকের থলি। স্বাস্থ্য ফের ফিরেছে পরীর, দিব্যি আবার মুটোতে শুরু করেছে।

চোখ পাকিয়ে বললাম,—একদম আর দেখা নেই কেন? আসিস না যে?

পরীর মুখে অমলিন হাসি, —একটুও সময় পাই না গো, বউদি।

—খালি খেটে মরছিস তো?

—সংসারের চাকা তো চালাতেই হবে গো।

...ছাদে আমি একটা বাগানও করেছি বউদি। সকাল থেকে রাত তার পেছনেই সময় দিতে হয় অনেক।

—হঠাৎ বাগান?

—ইচ্ছে হলো। এই তো দ্যাখো না, সার কিনে নিয়ে যাচ্ছি। নিমখোল

আছে, বোনডাস্ট আছে...। অনেক ফুল ফুটেছে গো। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া...

—তোর ফুলের শখ আছে জানতাম না তো?

—হয়েছে। ফুল ফুটলে তাকিয়ে থাকতে কী ভালো যে লাগে। আমার হাতেই ফুটল, এতে আর কারুর কোনো হাত নেই, ভাবলেই আমার গায়ে কেমন কাঁটা দেয়। ...এসো না গো, দেখে যাও একদিন।

অস্ফুটে বললাম, — যাবো।

পরী চলে যাচ্ছে। দুলে দুলে। ধীর পায়ে।

বড় দ্রুত ঝাপসা হয়ে গেল পরী।

www.boiRboi.blogspot.com

এলেবেলে

—এ্যাই ছোটু, কী তখন থেকে রোডর‍্যাশ খেলে যাচ্ছিস! কম্পিউটারটা এবার বন্ধ কর না।

—আর পাঁচটা গেম দিদি। ওন্‌লি ফাইভ।

—না। আর এক বারও না। রাত কটা বাজে খেয়াল আছে?

—মাত্র তো টেন ফিফ্‌টিন। কাল তো স্কুল নেই। সানডে।

—তাই বুঝি রাতদুপুর অব্দি জ্বালাবি? আমার ভাল লাগছে না।

—তুই ঘুমিয়ে পড় না। মা বলেছে আজ আমি টেন থারটি অব্দি খেলতে পারি।

—মা তো বলবেই। মা'র তো এখন খুশিই খুশি।

—হ্যাঁ রে, দিদি, মা'র যেন কী একটা হয়েছে! এখন সব সময়ে খুশি থাকে। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে আজ গানও গাইছিল। বিকেলে দুধ খাইনি বলে একটুও বকল না। একবারও গোমড়া গলায় বলল না, ছোটু বি এ গুড বয়। অনেক ধাড়ি হয়েছ, দুধ নিয়ে আর হ্যাংকিপ্যাংকি কোরো না। রাত্তিরে আজ খাইয়েও দিল। হেসে হেসে।

—এখন ওরকম কত ঢং করবে! নাচবে, গাইবে, তোকে লাই দেবে, আমায় মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে...

—কেন? কেন?

—উনি আবার বিয়ে করছেন যে।

—কী? কী করছে?

—আহ, কম্পিউটারটা অফ করবি? সব কথা কি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলা যায়?

—তুই না...! এবার শান্তি হয়েছে তো? ...হ্যাঁ, কী করছে মা?

—বিয়ে।

—যাহ্। মা বিয়ে করতে যাবে কেন?

—করছে।

—তা হয় নাকি? মা কেন বিয়ে করবে?

—হাঁদার মতো কথা বলিস না তো। ইচ্ছে হয়েছে তাই করছে। প্রাণে পুলক জেগেছে, তাই করছে।

—পুলকটা কী রে দিদি?

—ও একটা ব্যাপার আছে। তুই বুঝবি না।

—এঁএঁএঁহ্, তুই যেন সব বুঝে উল্টে গেছিস!

—ভুলে যাস না ছোটু, তোর থেকে আমি চার বছরের বড়। ফোর ইয়ার্স থ্রি মান্‌থস্। আমি এখন ইলেভেন প্লাস।

—তো?

—তোর থেকে আমার বুদ্ধিও বেশি। বুঝিও বেশি। তোর মতো লেবদুশও নই, আমার চোখ কান অনেক বেশি খোলা থাকে।

—ব্যাস, তাতেই তুই জেনে গেলি মা আবার বিয়ে করছে?

—ইয়েস। নেক্সট মান্‌থে। নিজের কানে শুনেছি দিদা ছোট্‌দিদাকে টেলিফোনে বলছিল....

—কী বলছিল?

—গায়ের ওপর লাফিয়ে এলি কেন? সরে বোস্। ...দিদা বলছিল, রুমুটা আর কদ্দিন একা একা থাকবে ... সামনে গোটা জীবনটা পড়ে...

www.boiRboi.blogspot.com

—মা একা কোথায় রে দিদি? আমরা তো আছি। তুই, আমি, দিদা...

—কী করা যাবে, মা নিজেকে একা মনে করে। বিয়ে করে দোকা না হলে তার যে সুখ হচ্ছে না। ...দিদা বলছিল, আমিই রুমুকে বলেছি, মনস্থির যদি করেই থাকিস, তাহলে আর দেরি করিস না। তোরও বয়স বাড়ছে, ছেলে-মেয়েদুটোও বড় হয়ে যাচ্ছে...। দিদার সঙ্গে ডিসকাস করেই নেক্সট মান্‌থে বিয়ের ডেট ফেলেছে মা।

—ও। কাকে ... বিয়ে ... করছে?

—গেস্ কর।

—আমরা তাকে চিনি?

—খুব চিনি। ভাল ভাবেই চিনি।

—আমাদের বাড়ি আসে?

—রেগুলার আসে।

—বিপ্লব মামা?

—এই তো, বুদ্ধি খুলেছে।

—কিন্তু বিপ্লবমামার সঙ্গে মার কী করে বিয়ে হবে? বিপ্লব মামা তো মামা!

—সো হোয়াট? হতেই পারে। মার ভাই তো নয়। মার অফিস কলিগ, মার বন্ধু, তাই আমরা মামা বলি। ওতে কি বিয়ে আটকায় নাকি?

—ও।... কী ভাবে বিয়েটা হবে? মা কনেবউ সাজবে? তুতুলমাসি যেরকম সেজেছিল?

—মনে হয় না। মেহেন্দি টেহেন্দি, চন্দন টন্দন বোধহয় লাগাবে না। ঘটা করে অনুষ্ঠান তো হচ্ছেই না। দিদা, বলছিল, দুজনে জাস্ট রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়েটা সেরে আসবে, তারপর ছোট করে একটা পার্টি দেবে।

—দিদা তোকে বলছিল?

—নাহ্। ছোট্‌দিদাকে।

—দিদাকে তুই তক্ষুনি জিজ্ঞেস করলি না কেন?

— চান্স পেলাম কোথায়! মা আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এল যে! ... জানিস ছোটু, এরকম কিছু একটা যে হতে চলেছে এ আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম।

—হাউ?

—হাউহাউ করিস না। বললাম তো, চোখ কান খুলে রাখলে অনেক কিছুই টের পাওয়া যায়। বিপ্লবমামার সঙ্গে মার যেরকম ইন্টিমেসি... দুজনে যে ভাবে চোখে চোখে কথা হয়... রাতে যে রকম নীচু গলায় ফোন চলে দুজনের ... মা ব্লাশ করে... মানে লজ্জা পায়...

—হ্যাঁ রে দিদি ঠিক বলেছিস। আমিও একদিন দেখেছি। বিপ্লবমামা মার কাঁধ ধরে টানছিল... শোল্ডারের এই জায়গাটা...। আমি যেই ঘরে ঢুকেছি, ওমনি ছেড়ে দিল। তারপর মা হাসতে হাসতে বিপ্লবমামাকে ঘুষি দেখাচ্ছিল।

—কবে? আমাকে বলিসনি তো!

—মনে ছিল না। এক্ষুনি মনে পড়ল। ওটা লাভসিন্ ছিল, না রে?

— তাছাড়া আর কী। থারটিসিক্স ইয়ারের একটা মা কী করে যে ওই সব সিলি সিন্ করে!

—করতে নেই, না রে দিদি?

—জানি না। বাথরুম করে এসে বড় আলোটা নিবিয়ে দে। চোখে লাগছে।

—দিদি?

—উঁ?

—বিপ্লবমামাকে কী বলে ডাকব রে? মানে মার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে আর কী মামা বলে ডাকা যাবে?

—সে তোর যা খুশি তাই বলবি। বাবা বাপি ড্যাডি পাপা....

www.boiRboi.blogspot.com

—অত রেগে রেগে কথা বলছিস কেন?

—আমার ভাল লাগছে না।

—তুই কী বলে ডাকবি?

—ভেবে দেখিনি। হয় তো ডাকবই না।

—যাহ্, একটা কিছু বলে তো ডাকতেই হবে। এ্যাই এ্যাই, মিস্টার মিস্টার তো ডাকতে পারবি না।

—সে তখন দেখা যাবে। আমাদের ক্লাসের বৈজয়ন্তী তো তার স্টেপফাদারকে আংকল্ বলে।

—আমরাও তাই ডাকতে পারি। বিপ্লব আংকল .... বিপ্লব আংকল ....

—মন্ত্র জপছিস নাকি?

—না না, প্র্যাকটিস করছি।

—থাম তো এখন। কোথাকার কে একটা লোক... উড়ে এসে জুড়ে বসছে....তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।

—যা বলেছিস। ...বিপ্লবমামাটা কেন যে মার অফিসে ট্রান্সফার হয়ে এল! আর এল তো এল, মারই বা কী দরকার ছিল তার সঙ্গে এত ভাব জমানোর।

—বড়দের কী কোনও সেন্স আছে! ওদের ওরকম ভাব টাব হয়েই যায়। যখন তখন। বাবাও তো ভাব করেছিল। পিয়ালিআন্টির সঙ্গে।

—হুঁউউ।

—মার তাও বিপ্লবমামার সঙ্গে অ্যাফেয়ার হয়েছে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার অনেক পরে। বাবা তো মার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগেই....

—তাই বুঝি?

—তুই আর জানবি কী করে! তুই তো তখন অ্যাত্তুটুকুন। সবে হামা টানছিস। পিয়ালি আন্টিকে নিয়ে মার সঙ্গে বাবার রোজ ঝগড়া হত তখন।

রোজ। কী চেঁচান চেঁচাত দুজনে। মা বলত, তুমি একটা ডিবচ, আমার জীবনটাকে তুমি নষ্ট করে দিয়েছ। বলতে বলতে মা রেগে গিয়ে আঁচড়ে দিত বাবাকে, কামড়ে দিত। আর বাবা তখন বলত, বিচ, বিচ, ইউ আর আ বিচ্।

—বিচ মানে তো ফিমেল ডগ, ডিবচ মানেটা কী রে?

—খুব খারাপ গালাগাল। তোকে জানতে হবে না।

—বড়রা রেগে গেলে খারাপ গালাগাল দেয়, তাই না দিদি?

—হুঁ। রাগলে বড়রা মানুষ থাকে না, অ্যানিম্যাল হয়ে যায়।

—মা কাউকে খারাপ কথা বলতে পারে ভাবাই যায় না, তাই না রে?

—বাবাকে দেখেও কি মনে হয়? হি ইজ সো জেন্টল্, সো লাভিং...। দেখেছিস তো, বাবা যখন আমাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়, কী নরম ভাবে কথা বলে আমাদের সঙ্গে।

—নেক্সট দিন বাবা আমাকে একটা মেটাল বে-ব্লেড কিনে দেবে বলেছে।

—মেটাল বে-ব্লেড? নিশ্চয়ই তুই চেয়েছিলি?

—না। বিলিভ মি। বাবা নিজে থেকেই...

—মা জানে? মাকে এসে বলেছিলি?

—না।

—দেখিস, মা না চটে যায়। একে মেটাল বে-ব্লেড মা দু চক্ষে দেখতে পারে না, তার ওপর সেটা দিচ্ছে বাবা...! এমনিতেই তো বাবা কোনও গিফ্‌ট দিলে মার ভুরু কুঁচকে যায়।

—কী হবে তাহলে? নেব না?

—নিতে পারিস। এখন বোধহয় মা প্রবলেম করবে না। একে আনন্দে ভাসছে, তার ওপর বিয়ে করছে বলে মনে মনে একটু চাপেও আছে...। মনে হয় চুপচাপ হজম করে নেবে।

www.boiRboi.blogspot.com

—হিহি। হিহি।

—হাসিস না। হেংলু কোথাকার।

—আহা, বাবা মার কাছ থেকে কিছু নেওয়া হ্যাংলামি নাকি? আর এটা তো বাবা যেচে আমায় দিচ্ছে। ভালবেসে।

—কচু। বড়দের অ্যাক্টিং তুই চিনিস না। দুঃখ পাবি বলে এতদিন বলিনি.... ডিভোর্সের সময়ে এই বাবাই বলেছিল ছেলেকে আমার দরকার নেই, শুধু মেয়েটাকে চাই।

—তাই?

—ইয়েস। সেটা হলে তুই একটা ফ্যামিলিতে, আমি আর একটা ফ্যামিলিতে।

—গেলেই পারতিস।

—এমা, কেঁদে ফেললি কেন? আমি কি সত্যি সত্যি গেছি নাকি? পিয়ালি আন্টির ব্যাপারটা তো আমি জানতামই। তার পরেও তোকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে স্টেপমাদারের সঙ্গে থাকতে যাব? লইয়ার আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আমি স্ট্রেট নো বলে দিয়েছি।

—আই লাভ ইউ দিদি।

—হয়েছে, হয়েছে। ঝগড়া করার সময় কথাটা যেন মাথায় থাকে। ...নে, এবার চোখ বোঁজ। ও ঘরে টিভির আওয়াজ বন্ধ হল, মা এক্ষুনি রাউন্ডে আসবে।

—ছোটু...? ছোটু, ঘুমিয়ে পড়লি?

—না। ঘুম আসছে না রে দিদি।

—আমারও। খালি হিজিবিজি চিন্তা আসছে মাথায়।

—মার বিয়ের কথা ভাবছিস?

—সঙ্গে আমাদের কথাও ভাবছি রে। তোর কথা। আমার কথা। দিদার কথা। কী হবে আমাদের, কোথায় যাব, কী ভাবে থাকব...

—কোথায় আবার যাব? এখানেই থাকব।

—কিন্তু মা কি বিয়ের পরে আর এ বাড়িতে থাকবে?

—কেন থাকবে না? বিপ্লবমামা... থুড়ি, বিপ্লব আংকল্... না না, এখনও তো বিপ্লবমামা... এখানেই তো চলে আসতে পারে। এখন আমরা চারজন আছি, তখন পাঁচজন হব।

—দূর বুদ্ধু, মার বর মার বাপের বাড়িতে থাকতে রাজী হবে কেন? তার নিজের ঘরবাড়ি আছে, মা বাবা আছে, সে চাইবে বউও সেখানেই গিয়ে থাকুক। বিয়ের পর বউদের তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়াটাই নিয়ম।

—আর আমরা? আমরা তখন কোথায় যাব?

—মা যদি নিয়ে যায়, তো মার সঙ্গে।

—নিয়ে যায় মানে? নাও নিয়ে যেতে পারে?

—কিছুই ইম্‌পসিবল্ নয়।

—যাহ, এ রকম আবার হয় নাকি? মা এক জায়গায়, আর আমরা অন্য জায়গায়?

—হতেই পারে। মা হয়তো বলল, তোরা দিদার কাছে থাক... তোদের নিয়ে গেলে দিদা একা হয়ে যাবে... আমি রোজই একবার করে তোদের দেখে যাব...

—এ্যাই দিদি, তুই সত্যি বলছিস? আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস না তো?

—না রে, কথাটা মনে পাক খাচ্ছে তো, তাই বলে ফেললাম।

—কী হবে তাহলে?

—সহ্য করতে হবে। হজম করতে হবে। বড়রা যা ডিসিশান নেয়, তাই তো আমাদের মানতে হয়।

—আচ্ছা দিদি, আর একটা কাজও তো করা যায়।

—কী?

www.boiRboi.blogspot.com

—দিদাকেও যদি মা সঙ্গে নিয়ে যায়, তাহলে তো আর দিদাকে একা থাকতে হয় না। আমরা সবাই বিপ্লবমামাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব।

—হাসালি ছোটু। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দিদা থাকবে? মেয়ের শ্বশুর শ্বাশুড়ির সঙ্গে? হয় কখনও?

—কেন হয় না? বুড়োবুড়ি একসঙ্গে থাকাই তো ভাল।

—দিদা যাবেই না। দিদার একটা প্রেস্টিজ আছে।

—আর একটাও করা যায়। বিপ্লবমামা একটা আলাদা বাড়ি নিক, সেখানে মা, বিপ্লবমামা, তুই আর আমি থাকব। দিদা এ বাড়িতে যেমন আছে থাকুক, ও বাড়ির দাদু দিদাও থাকুক নিজেদের বাড়িতে। বিপ্লবমামা আর মা তাদের দেখাশুনো করলেই তো হল।

—দিদাকে একলা ফেলে চলে যাবি? কষ্ট হবে না?

—তাহলে আমরা কী করব? কোথায় যাব?

—দ্যাখ, মা আর বিপ্লবমামা কী ঠিক করে।

—বিপ্লবমামা তো খুব ভাল লোক, না রে দিদি?

—তাই তো মনে হয়। বেশ অ্যাফেকশনেট, কেয়ারিং...

—তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কথাটাও ভাববে?

—কী জানি, বড়দের মতিগতি বোঝা ভার। এই যে পিয়ালিআন্টি... আমাদের সঙ্গে কী সুন্দর ব্যবহার করে... আমি ওদের ফ্যামিলিতে গিয়ে থাকলেও কি ঠিক এরকমটাই করত? প্রথম প্রথম আদরযত্ন করত হয়তো, কিন্তু তারপর ট্রিটমেন্টটা কি একটুও বদলে যেত না? অন্তত গাবলু হওয়ার পর? বিপ্লবমামাদের সংসারেও ওরকম একটা গাবলু টাবলু এসে গেলে আমাদের ওপর কার কত টান থাকবে সন্দেহ আছে। হয়তো সেই হাফব্রাদার, কি হাফসিস্টারকে নিয়েই একটা কোনও প্রবলেম হয়ে গেল।

—মার আবার বাচ্চা হবে কী রে?

—না হওয়ার তো কিছু নেই। বৈজয়ন্তীরই তো একটা হাফসিস্টার আছে।

—হাফ কেন? পুরো কেন নয়?

—ওরে বুদ্ধুরাম, বাবা আলাদা হলে ভাইবোনরা পুরো ভাইবোন হয় না। অর্ধেক বনে যায়। সেটাই নিয়ম।

—আমাদের হাফ ভাইবোন দরকার নেই। চাই না।

—ফের হাঁদাগঙ্গারামের কথা! ওরে স্টুপিড, আমাদের চাওয়ার কী দাম আছে? নাথিং! থাকলে মা কি আবার বিয়ের কথা ভাবত? নাকি আমরা না চাইলে বিয়েটা ক্যানসেল হয়ে যাবে? আমাদের সুবিধে অসুবিধের কথা মা বাবারা থোড়াই ভাবে!

—হুম্।

—এই যে তুই এখনও রাত্তিরবেলা মাঝে মাঝেই মার বিছানায় দৌড়ে চলে যাস, আর তো সেটাও পারবি না। প্রবলেমটা কি মা মাথায় রেখেছে?

—রাখেনি, না?

—প্রশ্নই আসে না। মা এখন বরের চিন্তায় মশগুল।

—বলিস না রে দিদি, আমার বড্ড ভয় করছে।

—ওফ্, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। স্টেডি হ বুদ্ধু, স্টেডি হ। ভয়টাকে পুরো গিলে নে। আমরা যে কষ্ট পাচ্ছি, নার্ভাস হয়েছি, বড়রা যেন একদম টের না পায়। যেখানেই থাক, যে ভাবেই থাক, খাবি দাবি, হাসবি খেলবি, স্কুলে যাবি ....। পুরো নর্মাল থাকার অ্যাক্টিং করে যা।

—পারব কী?

—পারতেই হবে রে ছোটু। এই পারাটাই তো বড় হওয়া।

www.boiRboi.blogspot.com

মূল্যবোধ

নিতে আসার কথা ছিল সাড়ে তিনটেয়। পাক্কা তিনটেয় চলে এসেছে ছেলেটা। অপেক্ষা করছে নীচে। গাড়িতে। ধীরেসুস্থেই তৈরি হচ্ছিলেন অনুপম। ভাঁজভাঙা পাঞ্জাবির ওপর কাশ্মীরি জ্যাকেটখানা চড়ালেন। ছাইরঙা পশমি কাপড়ে সুতোর সূক্ষ্ম কারুকাজ। খাসা দেখতে। দামীও। অবশ্যই কেনা নয়। শৌখিন মহার্ঘ বস্তুর পিছনে গাঁটের কড়ি ঢালাটা অনুপমের ধাতে নেই। এক গুণীজন সম্বর্ধনায় জ্যাকেটখানা পেয়েছিলেন গত বছর। অনুপম আয়নায় নিজেকে নিরীক্ষণ করলেন একটুক্ষণ। নাহ্ পাঞ্জাবির সঙ্গে বেমানান হয়নি। শালও নেবেন কি একটা? কলকাতায় এখনও তেমন শীত পড়েনি, তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি মফস্বলের দিকে ঠান্ডা তো একটু লাগতেই পারে। থাক সঙ্গে। প্রয়োজন হলে জড়ানো যাবে।

সুপ্তি কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলছে। হ্যান্ডসেট্‌টা নিয়েই ঘরে এল। মাউথপিসে হাত চেপে বলল,—ফিরছ কটায়?

—দেখি কখন ছাড়া পাই।

—সোজা ও বাড়ি চলে যাবে? নাকি আমরা একসঙ্গে.....?

অনুপমের ভুরুতে হাল্কা ভাঁজ পড়ল। গত সপ্তাহে মিলির দেওর এসেছে শিকাগো থেকে। বড়দিনটা এ দেশে কাটিয়ে জানুয়ারির গোড়াতেই আবার ফিরে যাবে কর্মস্থলে। ছোট পুত্রের গৃহে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আজ ছোটখাটো

একটা গেটটুগেদারের আয়োজন করেছেন বেয়াইমশাই। ছেলে আর কত হাঁচোরপাচোর করে এর-ওর বাড়ি ছুটবে, তার চেয়ে বরং আত্মীয়বন্ধুরাই একত্র হয়ে দেখাসাক্ষাতের পালাটা চুকিয়ে যাক। যত্ত সব অকাজের অনুষ্ঠান। কিন্তু না গেলেও তো নয়। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বলে কথা। বইমেলার অজুহাতে লৌকিকতা সামাজিকতা তো বিসর্জন দেওয়া যায় না। আবার যে আসরে তিনি মধ্যমণি নন, সেখানে মুখে ইলাস্টিক হাসি টেনে নাড়ুগোপালের মতো বসে থাকাটাও যে কী বিরক্তিকর! অবশ্য অনুপম সেটা ভালোই পারেন, এই যা বাঁচোয়া। পারেন বলেই না তিনি আজ খ্যাতিমান। পারেন বলেই তো ক্ষমতার অলিন্দে আজ তাঁর ঘোরফেরা।

বিরক্তি হঠিয়ে অনুপম মাথা নাড়লেন,—নাহ্, তুমি চলে যেও। আমার দেরি হতে পারে। আমি নয় সোজাই ও বাড়ি.....

—কেন যে জেনেশুনে অত দূর যেতে আজ রাজি হলে! সুপ্তির গলায় মৃদু অসন্তোষ,—কোনও মানে হয় না।

কোনও মানে যে হয় না সে তো অনুপমও জানেন। তিনি ফিতে না কাটলে বইমেলা কি চালু হবে না? তবে হ্যাঁ....একটু একটু মানে তো আছেও। খোদ শিক্ষামন্ত্রীর ছোট শালা বইমেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট, তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় কি? সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে রাজ্যের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে খানিকটা মিঠেকড়া সমালোচনা করেছিলেন অনুপম, তাতে শিক্ষামন্ত্রী কিঞ্চিৎ চটেছেন, ওই রাগটায় চটপট গ্যাটিস মেরে দেওয়াই তো ভালো।

তা এত সব কথা সুপ্তিকে অনুপম বলবেন কেন। সামান্য হেসে বললেন, —দেখলে তো সেদিন কত আশা করে এসেছিল ছেলেগুলো, মুখের ওপর ফিরিয়ে দেব?

—যা খুশি করো। তবে পারলে চটপট কেটে এসো।

—হুম্। আগে গিয়ে পৌঁছোই তো।

নীচে এসে গাড়িতে বসতেই মনটা ভারী প্রফুল্ল হয়ে গেল অনুপমের। চমৎকার আরামপ্রদ গাড়ি। প্রায় নতুনই মনে হয়। বাইরে আকাশ ঝকঝকে

www.boiRboi.blogspot.com

নীল, বাতাসে হাল্কা শীতের আমেজ, জার্নিটা ভালোই হবে। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল,—কোন দিক দিয়ে যাব? বাইপাস?

বইমেলা কমিটির ছেলেটি শশব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়েছে,—বাইপাসই বলি স্যার? ফাঁকায় ফাঁকায় যেতে পারবেন।

পিছনের সিট জুড়ে হাত-পা মেলে বসেছেন অনুপম। মেজাজি ভঙ্গিতে বললেন,—দূরত্ব একটু বেশি হয়, তবে ওই পথে যাওয়াই ভালো। সময় বাঁচে।

—গাড়িতে এসি আছে স্যার। কাচ তুলে এসি চালিয়ে দিতে বলব?

—কী দরকার! ডিসেম্বর মাস....সিগারেট-ফিগারেটও খাব....। বলতে বলতে পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ালেন অনুপম। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের ভাব ফুটেছে মুখে,—এই দ্যাখো, প্যাকেটটা ফেলে এলাম নাকি?

—তাতে কী আছে! নিয়ে নিচ্ছি। এই....এই.....রোকো।

কসবার মুখটায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল ছেলেটা। মিনিট তিনেকের মধ্যেই সিগারেট-দেশলাই সহ ফিরেছে। একখানা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে অনুপম প্যাকেটখানা চালান করলেন পকেটে। কুড়িখানার প্যাকেট; কাল সকাল অবধি চলে যাবে। সিগারেট ধরাতে গিয়েও থেমেছেন কী মনে করে। প্যাকেটখানা ফের বার করে বাড়িয়ে দিলেন ছেলেটার দিকে, —চলে নাকি?

ছেলেটা প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠেছে,—না না...কী যে বলেন....!

—আহা, সংকোচের কী আছে? খেলে নাও না।

—না মানে....আমার তেমন নেশা নেই....আপনি ধরান স্যার। অনুপম আর পীড়াপীড়ি করলেন না। ছেলেটার বিগলিত ভাব দেখে মনে মনে হেসেও নিলেন একটু। ছাত্রছাত্রী মহলে এই স্ট্র্যাটেজিটা বেশ কাজে দেয়, জনপ্রিয়তা বাড়ে। খ্যাতিমান অধ্যাপক অনুপম সিংহের এই সিগারেট অফার করা ছেলেটা চিরকাল মনে রাখবে, অনুপম জানেন।

ধোঁয়া ছেড়ে অনুপম বললেন,—আমায় এত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছ যে? তোমাদের অনুষ্ঠান কটায়?

—সাড়ে পাঁচটায় স্যার।.....ভাবলাম এতটা পথ....বারুইপুরের পর রাস্তার হালও ভালো নয়.....আগে আগে পৌঁছলে আপনি একটু জিরিয়েও নিতে পারবেন....

—আমি কিন্তু ছটা-সাড়ে ছটায় ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। আটটার মধ্যে আমায় কলকাতায় ফিরতেই হবে। অনুপমের স্বর সামান্য ভারী হল, —আমার আজ আরও একটা অনুষ্ঠান আছে কিন্তু।

—নো প্রবলেম। উদ্বোধনটা করে দিয়েই নয় আপনি....

—বাড়িতে কিন্তু নয়। নিউ আলিপুরে পৌঁছে দিতে হবে।

—সে স্যার আপনি যেখানে বলবেন।

কথাটা বলেই মনে মনে ছোট্ট একটা হিসেব করে নিলেন অনুপম। যদি সত্যিই আটটার মধ্যে কলকাতা ফেরা যায়, সুপ্তিকে নয় বাড়ির গাড়িটা বার করতে বারণই করে দেবেন মোবাইলে। সুপ্তিকে তুলে নিয়েই নয় যাবেন নিউ আলিপুরে। ফেরার পথে রচনা-টচনাদের গাড়ি তো আছেই। লিটার তিনেক পেট্রোল বেঁচে যাবে, মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে মন্দ কী! অবশ্য বইমেলাতে নিজের গাড়ি নিয়ে যেতে পারলে পুরো ট্যাংকিটাই লোড করিয়ে নেওয়া যেত। ছেলেগুলো সেদিন এমন আমরা গাড়ি আনব, আমরা গাড়ি আনব, করল!

যাক গে যাক, যা হয়নি তা নিয়ে আপশোস করা অর্থহীন। যেটুকু পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকাই ভালো।

অনুপম সিটে হেলান দিলেন,—তা তোমাদের ওখানে আর কে কে আসছেন আজ?

—আপনি তো উদ্বোধক। এছাড়া থাকবেন জেলা সভাধিপতি, স্থানীয় বিধায়ক, মহকুমা শাসক....। আর বিশেষ অতিথি হিসেবে সাহিত্যিক সর্বজিৎ গুপ্ত।

www.boiRboi.blogspot.com

মেজাজটা ঈষৎ কষটে মেরে গেল অনুপমের। ওসব এম-এল-এ, এস-ডি-ওই তো বেশ ছিল, আবার সর্বজিৎকে কেন ঢোকাল ব্যাটারা? সর্বজিৎ গুপ্তর এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি, গ্ল্যামারের জোয়ারে ভাসছে। ছেলেমেয়েরা সর্বজিৎকে দেখলে যেন হামলে পড়ে। সে হাজির থাকলে অনুপমের দিকে কি কেউ সেভাবে তাকাবে? কী আছে সর্বজিতের লেখায়, অ্যাঁ? যত্ত সব বানানো প্যানপ্যানানি গপ্‌পো! অবৈধ প্রেম! অনৈতিক চিন্তাভাবনা! ট্র্যাশ, এক্কেবারে ট্র্যাশ। শ্রেণিচেতনার বালাই নেই, তবু কী করে যে এই সরকার তাকে তোল্লাই দেয়! আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ওপর একখানা ওজনদার কাজ করার পরিকল্পনা আছে অনুপমের, সেখানে সর্বজিৎকে শুইয়ে দিতে হবে।

ভাবনাটুকুতে জ্বালা যেন জুড়োল একটু। অনুপম আলগা চোখ মেললেন বাইরে। গাড়ি বাইপাসে পড়ে ছুটছে দক্ষিণমুখো। ডানদিকে সার সার বহুতল অট্টালিকা। সঙ্গে বিদেশি কেতার দোকান-বাজার। এক একটা খুদে নগরী যেন। অনুপমের এক পুরনো ছাত্র ফ্ল্যাট কিনেছে এদিকে, গৃহপ্রবেশের দিন তাঁকে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিল, অন্দরের ঠাটবাট দেখে অনুপম-সুপ্তি দুজনেই হাঁ। তবে বড্ড দাম। বড্ড দাম। একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে গেলে তিরিশ লাখ, চল্লিশ লাখ। হল না, হল না, এই জীবনে বোধহয় আর হল না।

অনুপমের চোরা শ্বাস পড়ল একটা। মরুক গে যাক, তাঁর বোসপুকুরের এগারোশো কুড়ি স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাটই বা এমন কী খারাপ! বিদ্বান হিসেবে তাঁর খ্যাতি জুটেছে, পাড়াপড়শি আত্মীয়বন্ধুরা সম্ভবত শ্রদ্ধাভক্তি করে, অভিজ্ঞ হাওয়ামোরগের মতো বাতাসের তালে তালে ঘুরতে পারার গুণে তিনি এখন মোটামুটি কেউকেটা ব্যক্তি, কত মানুষ তাঁর কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে আসে, পাঠ্যবই-টই লিখে বাড়তি রোজগারও নেহাত ফেলনা নয়, শান্তিনিকেতনেও একটা ছোটখাটো আশ্রয় বানিয়েছেন, ছেলে আমেরিকায় পড়ছে, মেয়ের বিয়েতেও সুপ্তি হাত খুলে খরচা করতে পেরেছে—এখন আর চল্লিশ লাখি, পঞ্চাশ লাখি ফ্ল্যাট কিনে তাঁর কীই বা এমন অতিরিক্ত মোক্ষলাভ হবে?

সামনের সিটে ছেলেটি খাড়া হয়ে বসে। কাঠ কাঠ ভঙ্গিতে। বুঝি বা একটু আগের অপ্রতিভতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ছেলেটাকে সহজ করার জন্য, কিংবা হয়তো মন থেকে উটকো চিন্তা দূর করার জন্য, অনুপম কথা শুরু করলেন,—তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি ভাই।

—আমি বিপ্লব, স্যার। ছেলেটা ধড়মড় করে ঘুরল,—বিপ্লব কয়াল।

নামটা শুনেই অনুপম আন্দাজ করে ফেললেন ছেলেটির বয়স বছর তিরিশ। সত্তরের দশক অবধি বিপ্লব নামটা রাখার খুব রেওয়াজ ছিল। আজকাল অবশ্য নামগুলো ঠাট্টার মতো শোনায়।

সামান্য হেসে অনুপম বললেন,—তা ভাই বিপ্লব, তোমাদের ওখানে আজ আর কী কী অনুষ্ঠান আছে?

—প্রোগ্রাম তো সকাল থেকেই চলছে, স্যার। আমাদের পলাশপুরের সমস্ত স্কুলের ছেলেমেয়েরা সকালে জাঠা বের করেছিল। প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে। স্বয়ং জেলা সভাধিপতি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

—বাহ্। খুব ভালো, খুব ভালো।

—তারপর ধরুন, বিকেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর গান থাকছে। ওয়ানঅ্যাক্ট নাটকও হবে। তারপর কবিতা পাঠ।

—কারা পড়বে? নামী কবি আসছেন কেউ?

—তেমন বিখ্যাত কেউ নেই স্যার। এই আমরাই....

—তুমি কবিতা লেখো নাকি?

—ওই আর কি। চেষ্টা করি। কোলে পড়ে থাকা ঝোলাব্যাগ থেকে একখানা চটি বই বার করে বাড়িয়ে দিল বিপ্লব,—এবার আমার এই বইটা বার হয়েছে স্যার। পড়ে দেখবেন।

বাদামী-সাদা মলাটে চোখ বোলালেন অনুপম। নোনা মাটির ঘ্রাণ। উল্টোলেন একটা-দুটো পাতা। তাতেই যা বোঝার বুঝে গেছেন। ছন্দ, যতির মা-বাপ নেই, ভাষাও বেশ কাঁচা। নির্ঘাত নিজের পয়সায় ছাপিয়েছে। এই

www.boiRboi.blogspot.com

কবিতা লেখার রোগ তাঁকেও ধরেছিল এককালে, সাবধানী মানুষ বলে সামলে নিতে পেরেছেন।

তবু বিপ্লবের ওপর একটু যেন মায়া জাগল। আহা, সংস্কৃতির চর্চাই তো করছে, গুন্ডা-বদমায়েশি তো করছে না। অভিভাবকের সুরে অনুপম জিগ্যেস করলেন,—তা বিপ্লবের কী করা হয়?

—একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করছি স্যার। আর সঙ্গে এই সাহিত্যচর্চা।

—মানে কবিতা লেখা?

—ওটা একট সাইড স্যার। আরও তো অনেক কিছু করার আছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো গল্পের বই পড়েই না, তাদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যেস তৈরি করার চেষ্টা করছি। পলাশপুরের লাইব্রেরিকে আরও বড় করার জন্য একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। তার সঙ্গে এই বইমেলার আয়োজন করাও তো একটা বিশাল কাজ স্যার। চলুন না, পলাশপুরে গেলেই বুঝবেন আমরা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য কী লড়াইটাই না করে চলেছি। জীবনমুখী গান নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। আমাদের লোকসংস্কৃতির ধারাগুলো যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য একটা সংগঠিত আন্দোলন....

সুযোগ পেয়ে দিব্যি লেকচার ঝেড়ে যাচ্ছে তো বিপ্লব! অনুপমের ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। তবে ছেলেটার জোশ আছে সন্দেহ নেই। অনুপম শুনছেন কি শুনছেন না, তার পরোয়া না করেই বকে যাচ্ছে অবিরাম। এই বয়সের ছেলেরা যেমন করে থাকে আর কি।

ঘুম তাড়াতে অনুপম আর একখানা সিগারেট ধরালেন। বিপ্লবের সরব উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেই ডুবে গেলেন কেজো চিন্তায়। সামনের সপ্তাহে শিলচরে একটা বড়সড় কনফারেন্স আছে, সেখানে একটা পেপার পড়তে হবে অনুপমকে। সারাংশ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন, তবে লেখাটা এখনও হয়ে ওঠেনি। অবশ্য সেটা বড় কোন সমস্যা নয়। অনুরাধা ঠিক ওই বিষয় নিয়েই তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করছে, অনুরাধার থিসিসের খসড়া থেকেই

মালটা মোটামুটি নামিয়ে দিতে পারবেন অনুপম। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে অনুরাধার নামটুকু শুধু দিয়ে দিলেই তো হল, ব্যস।.....শিলচরের উদ্যোক্তারা যাতায়াতের প্লেন ভাড়া দেবে, ট্রেনের টিকিট কাটাটা বোকামি হয়ে গেল না তো? পেমেন্টের সময়ে ওরা কি প্লেনের টিকিট দেখতে চাইবে? মনে হয় না। কত জায়গায়ই তো ফার্স্ট ক্লাস এসির ভাড়া দিয়েছে, অথচ অনুপম গেছেন স্লিপার ক্লাসে। কোথ্থাও তো কেউ কখনও টিকিট দেখতে চায়নি। ভদ্রতাবোধ থাকলে চাইবেই বা কেন? এই যে অনুপম পরিশ্রম করে যাবেন, মেধা আর মনন দিয়ে নিবন্ধ রচনা করবেন, তার জন্য ওই কটা বাড়তি টাকা তো তাঁর প্রাপ্যই হয়।....এর পর ফেব্রুয়ারিতে আছে বাংলাদেশ যাওয়া। ভাষাদিবসের সঙ্গে সঙ্গে এবার কক্সবাজার রাঙামাটিটাও ঘুরে আসতে হবে। সুপ্তিরও খুব যাওয়ার ইচ্ছে, নেবেন কি সঙ্গে? আট-দশটা জামদানি যদি কিনে আনে, সেগুলো বেচেই তো ওর খরচাটা উঠে যেতে পারে।....হুম, ভাবতে হবে, ভাবতে হবে।

ভাবতে ভাবতে অনুপমের চোখ দুটো এবার বুজেই এল। সিগারেটটা টোকা মেরে ফেলে দিয়ে ঘাড়টা ঝুলিয়ে দিলেন অল্প। সেমিনার, কনফারেন্স করে করে এই কায়দাটা তাঁর রপ্ত হয়ে গেছে। কে বুঝবে তিনি এখন এক নিমগ্ন শ্রোতা নন?

অন্তত বিপ্লব তো বুঝবেই না।

সাড়ে ছটায় হল না। বইমেলার ফিতে কেটে বেরোতে বেরোতে সাতটা বেজে গেল। এমন একটা লম্বা বক্তৃতা দিল জেলা সভাধিপতি, বাপ্‌স! মালগাড়ি চলছে তো চলছেই। এম-এল-এও কম যায় না! বিশ্বায়ন, ভোগবাদ, অপসংস্কৃতি থেকে জর্জ বুশ, সাম্রাজ্যবাদ এবং পরিশেষে নিজের রাজনৈতিক দলের জয়গান, কী ছিল না লেকচারে!

গাড়িতে উঠে অনুপম হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। মেজাজটা এখন তাঁর সপ্তমে চড়ে আছে। উদ্যোক্তারা কী অসভ্য, সর্বজিৎ স্টেজে বসেই সই বিলোচ্ছে, অথচ কেউ একবার আপত্তি করল না! উল্টে চোখেমুখে কী বিগলিত ভাব,

www.boiRboi.blogspot.com

যেন সর্বজিৎকে পেয়ে তারা ধন্য হয়েছে! যত সব মুর্খের দল। সর্বজিৎই বা কী ধরনের চিড়িয়া? তার পাশে বসে থাকা বিখ্যাত শিক্ষাবিদকে অর্বাচীন অনুরাগীর দল সেভাবে আমল না দিয়ে যে এক ধরনের অপমানই করছে, এই বোধটুকুও কি তার নেই? অভদ্র। অশিক্ষিত।

মোরামের রাস্তা ছেড়ে ক্ষয়াটে পিচ ঢালা পথে উঠেছে গাড়ি। ফেরার পথে বিপ্লব আর সঙ্গে নেই, এখন অনুপম একাই। অনুপম সিগারেট ধরালেন একটা। প্রকাণ্ড ফুলের তোড়াখানা আর এক বাক্স মিষ্টি উদ্যোক্তারা বসিয়ে দিয়েছে সিটে, অপাঙ্গে দেখছেন শুকনো শুকনো ফুলগুলোকে। কী কম্মে লাগবে ওই ফুল? জানলা দিয়ে ফেলে দিলেই তো হয়!

সামনের সিট থেকে ড্রাইভারের স্বর উড়ে এল,—ঠান্ডা কিন্তু আছে স্যার। কাচটা তুলে দিন।

বিরক্তির ঝাঁঝটা এসেই গেল অনুপমের গলায়,—তোমায় দেখতে হবে না। চালাও তো ঠিকঠাক।....কটা নাগাদ পৌঁছোব কলকাতায়?

—তা ধরুন প্রায় দু' ঘন্টা মতো তো লাগবেই।

—সে কী? এলে তো এক ঘন্টায়!

—তখন দিনের আলো ছিল স্যার। আর এখন দেখছেন তো কেমন ঘুরঘুটি আঁধার। তার ওপর কুয়াশাও আছে।

—অ।

পকেট থেকে মোবাইল ফোনখানা বার করলেন অনুপম। নেটওয়ার্ক আছে। এখন ফোন করে দেবেন কি সুপ্তিকে? কী লাভ? সুপ্তিকে নটা অবধি বাড়িতে অপেক্ষা করতে বললে এক্ষুনি চাট্টি কথা শুনতে হবে।

আবার ড্রাইভারের গলা,—আপনার বক্তৃতাটাই কিন্তু আজ সবচেয়ে ভালো হয়েছে স্যার।

আগুনে যেন খানিক জল পড়ল। অনুপম গলা ঝাড়লেন,—তুমি শুনেছ বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। পুরোটা। বই পড়ার উপকারিতাটা আপনি যা সুন্দর করে বোঝালেন! আহাহা, মনটা ভরে গেল। আর সবাই তো আগডুম-বাগডুম বকে গেলেন।

অনুপম চমৎকৃত। ড্রাইভার হলেও জ্ঞানগম্যি আছে তো! হিরে আর কাচের পার্থক্যটা বোঝে! মাথা ঝুঁকিয়ে তোড়ার রজনীগন্ধাটাকে একটু শুঁকে নিলেন অনুপম। বুকে বড় একটা শ্বাস ভরে বললেন,—তুমি বই পড়তে ভালোবাসো? মানে....পড়ো?

—একসময়ে অভ্যেস ছিল স্যার। শরৎচন্দ্র পড়েছি, আশাপূর্ণা দেবী পড়েছি, নীহাররঞ্জন পড়েছি....

—তাই নাকি? কদ্দুর পড়াশুনো করেছ?

—টেনে উঠেছিলাম স্যার। ফাইনাল আর দেওয়া হয়নি।

—কেন?

—গরিবের ঘরে যা হয় স্যার। বাবা মরে গেল....আমি বড় ভাই....একটা গ্যারেজে কাজ নিলাম....তারপর ড্রাইভিং শিখে এই লাইনেই রয়ে গেলাম।

—তা পড়ার অভ্যেসটা ছাড়লে কেন? সেটা তো রাখতে পারতে।

—সময় পাই না স্যার। পেটের ধান্দা....ঘর-সংসার....

—বিয়ে-থা করেছ?

—ছেলে কলেজে পড়ছে স্যার। বি কম্। মেয়ে ক্লাস নাইনে। গাড়ির গতি সামান্য বাড়াল ড্রাইভার,—কষ্ট করেও ওদের লেখাপড়াটা চালিয়ে যাচ্ছি স্যার। নিজে তো পারিনি, ওরা যদি পারে।

এতক্ষণ পর চালকটিকে ভালো করে লক্ষ করলেন অনুপম। আধো অন্ধকারে পিছন থেকে সেভাবে বোঝার উপায় নেই, তবে সাদামাটাই মনে হল। বয়স সম্ভবত পঞ্চাশের এপাশ-ওপাশে।

অনুপম জিগ্যেস করলেন,—তুমি থাকো কোথায়?

—আপনার বাড়ির কাছেই। রাজডাঙা।

www.boiRboi.blogspot.com

—ভাড়া বাড়ি?

—নিজের বাড়ি কোথ্থেকে করব স্যার? ভেবেছিলাম সোনারপুরের দিকে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করব, কিন্তু কী যে মাথায় ভূত চাপল! নিজের যেটুকু সঞ্চয় ছিল তার সঙ্গে ব্যাংক লোন নিয়ে এই গাড়িখানা কিনে ফেললাম। ব্যাংকের টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত এখন তো কিছুই করতে পারব না।

অনুপম আবার চমকিত। এমন ঝকঝকে সাজানো এসি গাড়িখানার মালিক ড্রাইভার স্বয়ং? লোকটার এলেম আছে তো! অস্ফুটে বলেই ফেললেন,—এই গাড়ি তুমি কিনেছ?

—ট্যাক্সি চালাতে আর মন চাইছিল না স্যার। ভাবলাম, নিজের একটা জিনিসও হবে, স্বাধীন ব্যবসাও করা যাবে....। এ গাড়ি আমার জান স্যার। কাউকে স্টিয়ারিং ধরতে দিই না।

—এখন কি ট্রাভেল এজেন্সিতে খাটাও?

—খাটাই। আবার সরাসরি ভাড়া নিই। এই তো বিপ্লববাবুই যেমন। আমার কাছে এলেন, কনট্র্যাক্ট করলেন....

—বিপ্লবকে তুমি আগে চিনতে?

—কাজের সূত্রে। ওঁদের অফিসও এক-দু'বার আমার গাড়ি নিয়েছে। ড্রাইভার একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর বলল,—বিপ্লববাবুর সঙ্গে আমার বনে ভালো। আমিও মোটামুটি ভালো রেট পাই, বিপ্লববাবুরও একটা পড়তা থাকে....

—পড়তা থাকে মানে? অনুপম সোজা হয়ে বসলেন।

—মানে উনি একটা কমিশন মতন পান। ড্রাইভার নির্বিকার,—এই তো, এই পলাশপুর যাওয়া-আসা....বইমেলা কমিটির থেকে বিপ্লববাবু নিয়েছেন হাজার, আমায় দিলেন আটশো। সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে থাকেন, ভারি সৎ লোক। আমার সঙ্গে অন্তত কোনও লুকোছাপা করেন না।

অনুপম স্তম্ভিত। ছেলেটা যাওয়ার সময়ে অত বাগাড়ম্বর করছিল, অথচ ভেতরে ভেতরে এই? কমিটির টাকা মারে?

বিড়বিড় করে অনুপম বলে উঠলেন,—এটা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় কাজ। নিজেদেরই বইমেলা, সেখান থেকে টাকা কামাচ্ছে....!

হর্ন বাজিয়ে ছোট্ট এক জনপদ পার হচ্ছে গাড়ি। তার মধ্যেই কথাটা কানে গেছে ড্রাইভারের। গিয়ার বদলাতে বদলাতে বলল, —অন্যায় কেন স্যার? গাড়ি ঠিক করার পরিশ্রমটা উনি করলেন, আপনার আসা-যাওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত হয়ে গেল, বইমেলা কমিটির কোনও ঝক্কি রইল না....এত কিছুর জন্য ওই কটা টাকা তোর ওঁর প্রাপ্য হয় স্যার। এ তো আজকাল সকলেই নেয়।

কথাগুলো কোথায় গিয়ে যেন বাজল অনুপমের। বড্ড চেনা চেনা যুক্তি। ভীষণ চেনা। অনুপম গুম হয়ে গেলেন। ড্রাইভার টুকটাক কথা চালিয়ে যাচ্ছে, হুঁ হাঁ করছেন শুধু।

রাত সাড়ে নটা বাজিয়ে দিয়ে নিউ আলিপুরে পৌঁছল গাড়ি। বারুইপুরে রেলগেট পড়ে ছিল অনেকক্ষণ, নরেন্দ্রপুরে এসে জ্যামে আটকে রইল, এই করে করেই তো খেয়ে গেল সময়।

বেয়াইবাড়ির গেটে থেমেছে গাড়ি। ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে ধরল। একগাল হেসে বলল,—আমার গাড়ি আজ ধন্য হল স্যার। আপনার মতন একজন বিদ্বান মানুষের পায়ের ধুলো পড়ল....

অনুপম মৃদু স্বরে বললেন,—হুঁ।

ড্রাইভার হাত কচলাচ্ছে,—একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। অনুগ্রহ করে অধমকে যদি একটা অটোগ্রাফ দ্যান....বাড়িতে ছেলেমেয়েদের দেখাব।

অনুপম চিৎকার করে বলতে চাইলেন, খবরদার। গলায় কোনও স্বর ফুটল না।

www.boiRboi.blogspot.com

হিসেব মেলে না

আজ আবার দোতলায় জোর ধুন্ধুমার। মাঝে কিছুকাল বন্ধ ছিল, ফের শুরু হয়েছে সম্প্রতি। মদে চুর হয়ে এসে যথারীতি নাচনকোদন জুড়েছে সাহেব। পিয়ালিও ছোড়নেওয়ালি নয়, পাল্লা দিচ্ছে সমানে। সাহেবের জড়ানো গলায় গালাগালির ফোয়ারা, তো পিয়ালির তীক্ষ্ণ স্বরে পালটা শাসানি! কাচের কী যেন আছড়ে পড়ল মেঝেয়, ঝনঝন কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি। পরক্ষণে আরও জোরে আওয়াজ। ভারী কিছু উলটোল বোধ হয়। সোফা টেবিল গোছের। আমার টিভি দেখা মাথায়। নৈশাহার সেরে, রান্নাঘর-টান্নাঘর গুছিয়ে সবে পছন্দ মতো চ্যানেল খুলে বসেছি, একঘেয়ে সিরিয়ালটা আজ যেন সামান্য জমছিল, কিন্তু ওপরতলার তাণ্ডবে শ্রবণসুখের দফারফা। ভলিউমও বাড়ানো যাবেনা, বুবলি পড়ছে ও ঘরে।

পাশেই তাপস। সোফায় হেলান, ঠোঁটে সিগারেট, হাতে টিভির রিমোট। বিজ্ঞাপনের বিরতির জন্য ওত পেতে থাকে তাপস, প্রথম সুযোগেই চ্যানেল পালটে ঢুকে পড়ে ফুটবল, ক্রিকেটে। ওপরের দাপাদাপিতে তাপসের ভুরুতেও ভাঁজ।

চাপা গলায় বললাম,—বুবলির দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো। মেয়েটার সামনে পরীক্ষা...

—ঘরে খিল আঁটলেও কি রেহাই পাওয়া যাবে? বাড়িটাই বদলানো দরকার।

—তো উঠেপড়ে একটু লাগো না। জমিটা কিনে ফেলে রেখেছ কেন?

—যাহ্ বাবা! কর্পোরেশনে প্ল্যান জমা দিয়ে এলাম...! স্যাংশনটা হোক, সঙ্গে সঙ্গে কাজ স্টার্ট করে দেব।

—তদ্দিনে এ বাড়িতে এক্সট্রিম কিছু না ঘটে যায়।

—মনে হয় না। দ্যাবা দেবী সে দিক দিয়ে যথেষ্ট সেয়ানা।

দুজনেই গানবাজনার লোক, খানিকক্ষণ ভজনকেত্তন করে আপনিই থেকে যাবে। আমি ওরিড বুবলিকে নিয়ে। এমন একটা বাজে পরিবেশে বেচারা...

সত্যি, বাড়িটা যেন নরক হয়ে উঠেছে। সাহেব যেমন মদ গিললে পশু, পিয়ালিও ঠিক তেমনই জাঁহাবাজ। ছেলেটা যখন মাতাল হয়ে ফেরে, গায়ে পড়ে তাকে খোঁচাখুঁচি না করলেই হয়। রা না কাড়লে সাহেব কতক্ষণ চেল্লাবে একা একা? তা পিয়ালির সেই জ্ঞানগম্যি থাকলে তো। মুখে মুখে চোপা চালাবেই, ঠেস দেওয়া দেওয়া কথা ছুড়বেই, সাহেব খেপবে আরও, এটা ছুড়বে, ওটা ভাঙবে...। আমরা তো নেহাতই ভাড়াটে, আমাদের কথা নয় বাদই দিলাম, নিজেদের ঘরেই যে একটা শিশু আছে, বুড়ি শাশুড়ি আছে, সে বোধটুকুও থাকে না পিয়ালির।

বিরক্ত মুখে বললাম—কেন যে মরতে ওরা বিয়ে করেছিল!

—পেরেম হয়েছিল যে।

—ঝাড়ু মারি অমন প্রেমের মুখে।

এখন তো ও কথা বললে চলবে না। তাপস হাত বাড়িয়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। বাঁকা হেসে বলল,—তুমিই না একদিন বলেছিলে প্রেমের অনেক প্লাস পয়েন্ট আছে? পিয়ালির ভালবাসাই নাকি সাহেবকে বদলে দেবে?

—বলেছিলাম। তখন সে রকমই মনে হয়েছিল।

—মনে হওয়াটা কত ফাঁপা ছিল, সেটা এখন টের পাচ্ছ তো? তাপস দু-এক সেকেন্ড চুপ। কান পেতে শুনছে ওপরের কাজিয়া। তারপর একমুখ

www.boiRboi.blogspot.com

ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—শোনো, কাজের মানুষের বদ স্বভাব বদলাতে গেলে নিজেকেও অনেক সংযত হতে হয়। তুমি তোমার খেয়ালখুশি মতো ফুর্তি মেরে বেড়াবে, আর তোমার নেশাখোর বর মালটাল খাওয়া ছেড়ে পুতচরিত্র ভগবান বনে যাবে, এতটা আশা করা সিম্পলি বাড়াবাড়ি। অ্যাম আই রং? কী জবাব দেব? তাপস তো ভুল কিছু বলেনি। সাহেবের হাজার দোষ থাকতে পারে, পিয়ালিও মোটেই সুবিধের নয়। এখন তো মাঝে মাঝে পিয়ালিকেই আমার খলনায়িকা মনে হয়।

অথচ প্রথম প্রথম পিয়ালিকে একদম অন্যরকম লেগেছিল। কী সুন্দর কথা বলে, কী মিষ্টি ব্যবহার, দেখতেও যেন ঢলঢলে লক্ষ্মীপ্রতিমাটি! সাহেবের বউ হওয়ার আগেও পিয়ালিকে দেখেছি কয়েকবার। টিভির পরদায়। খবরের কাগজে। ম্যাগাজিনের পাতায়। গায়িকা হিসেবে তখনই সে বেশ সম্ভাবনাময়। ক্যাসেট বেরিয়ে গেছে খান তিনেক। পুরনো গানের রিমেক, রবীন্দ্রসঙ্গীত...। এক সেন্টিমিটার নাম করলেই বহু শিল্পীর লেজ মোটা হয়ে যায়, কিন্তু পিয়ালির পুচ্ছ মোটামুটি শেপেই ছিল। কবিতাদি তো পিয়ালি বলতে রীতিমত গদগদ তখন। পুত্রবধূ নাকি তাকে কথা দিয়েছে, সাহেবকে সে পুরোপুরি পালটে দেবে। শুনে ভাল লেগেছিল। প্রায় সাত বছর এ বাড়িতে ভাড়া আছি, সাহেবকে দেখছি কাছ থেকে। ছেলেটা এমনিতে মন্দ নয়, নেশা না করলে যথেষ্ট বিনয়ী, ভদ্র, শিষ্ট। অসম্ভব রূপবান। সাহেব তো সাহেবই। টকটকে রং, নীলচে চোখ, চওড়া কাঁধ, হাইট প্রায় ছ ফুট...। তার ঠাকুরদার মা নাকি মেম ছিল, সাহেব নাকি তার আদলটাই পেয়েছে। নেহাত মাকাল ফল নয়, গুণও আছে অজস্র। চমৎকার গান লেখে, সুর দেয়, বাজনাও বাজাতে পারে হরেক রকম। আমরা এখানে আসার পর পরই তো বিখ্যাত গায়ক সুরজিৎ রায় দলে ডেকে নিল তাকে, গিটারবাদক হিসেবে। তবে ওই যে, একটাই দোষ। নেশার দাস। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই, যখন ইচ্ছে বোতল খুলে বসে গেল। আর একবার মাতাল হল তো ব্যস, একেবারে বাপের কুপুত্তুর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যাকে তাকে খিস্তিখেউড় করছে। সিঁড়িতেই হয়তো হুড়হুড় মুতে দিল, রাস্তায় বেরিয়ে অকারণে হাতাহাতি করছে

লোকজনের সঙ্গে, কিংবা হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নর্দমায়...। একদিন তো নিজের মাকেই বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছিল, বেচারা কবিতাদি কোনও ক্রমে নেমে এসে আমাদের ঘরে আশ্রয় নেয়। এহেন সাহেবকে পিয়ালি যদি সত্যি সত্যি একটা সুস্থ জীবনে ফেরাতে পারে, তার চেয়ে আনন্দের খবর আর কী আছে!

প্রেম কী না পারে? মূককে সে বাচাল করে। পঙ্গু তার গুঁতোয় অবলীলায় ডিঙিয়ে যায় পাহাড়। সাহেবের নেশা ছাড়ানো নিশ্চয়ই তার চেয়ে কঠিন কাজ নয়!

কিন্তু কী হল শেষ পর্যন্ত? বিয়ের চারটে বছরও কাটেনি, একটা বাচ্চাও হয়ে গেছে, অথচ সাহেব ঘুরে ফিরে সেই পুরনো ফর্মে। পিয়ালি ছাড়া কাকেই বা এর জন্য দায়ী করব?

তবু ক্ষীণ প্রতিবাদ জুড়লাম, —সাহেবের রক্তে অ্যালকোহল মিশে গেছে। মদ ছাড়া ও আর বাঁচতেই পারবে না।

তাপস ফুৎকারে আমায় উড়িয়ে দিল,—বাজে কথা। যে সত্যিই নেশা ছাড়তে চেয়েছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিয়ের পর প্রথম চার ছ মাস তো দিব্যি ছিল। একটু আধটু টানুসটুনুস চলত হয়তো। কিন্তু কোনও সিন ক্রিয়েট করেছে কি তখন? সুবোধ গেরস্থর মতো সকালে উঠে বাজারে যাচ্ছে, বউকে নিয়ে রেকর্ডিংয়ে চলল, গানের ফাংশনে তাকে কম্পানি দিচ্ছে...। বউ রেওয়াজ করছে, সাহেব সঙ্গত করছে...দ্যাখোনি? শোননি? হঠাৎ সেই ছেলের নতুন করে মতি বিগড়োল কেন? প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েই ঊর্ধ্বপানে তাকাল তাপস। দোতলার কোন্দল স্তিমিত হয়েছে খানিকটা। হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা শব্দ ছুটে আসে, তবে তেমন ঝাঁঝাল নয়। নিজের অনুমান মিলে গেছে দেখে তাপস বুঝি আত্মপ্রসাদ অনুভব করল একটু। বিজ্ঞের মতো বলল,—আমি ডেড শিওর, সুরজিতের সঙ্গে পিয়ালি অত মাখামাখি না করলে সাহেব এখনও ঠিকঠাকই থাকত। আপনাআপনি ভুরুটা কুঁচকে গেল। গলা খাদে নামিয়ে বললাম,

www.boiRboi.blogspot.com

—সত্যিই কি পিয়ালি আর সুরজিতের মধ্যে কিছু আছে?

—নেই?

—কী জানি। অনেক সময় তো উলটোপালটাও রটে।

—কোনটা রটনা? সুরজিৎ রায় কি পিয়ালির গডফাদার নয়? পিয়ালিকে প্রোমোট করার জন্য সুরজিৎ কি লড়ে যাচ্ছে না? একটা অনুষ্ঠান তুমি দেখাতে পারবে সুরজিতের, যেখানে পিয়ালি প্রেজেন্ট নেই?

—গানের জগতে একটু-আধটু ব্যাকিং তো লাগেই।

—মনকে চোখ ঠারা কথাবার্তা বোলো না তো। ভুলে যেও না, সুরজিতের গ্রুপ থেকে সাহেব কিন্তু এখন আউট। গিটারিস্টের পোস্টটা খারিজ হয়ে গেছে।

—সে তো সাহেব মাল টেনে সুরজিৎকে মারতে গিয়েছিল, তাই।

—কেন মারতে গিয়েছিল? সুরজিৎ তার বউকে নিয়ে হোটেলের দরজা বন্ধ করবে, আর সে চৌকাঠে বসে বসে বেহালার ছড় টানবে?

সত্যি-মিথ্যে জানি না, এরকম গুজব একটা আছে বটে। পিয়ালি বউ হয়ে আসার কিছুদিন পরেই তো জোর রটনা, সাহেব-পিয়ালির শুভ পরিণয়ে নাকি ঘোর অমত ছিল সুরজিতের। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নাকি রাজি করিয়েছে পিয়ালি।

শুনে তখন খারাপ লাগেনি। মনে হয়েছিল, এই তো প্রেম। মেয়েটা তার কেরিয়ারের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সাহেবের হাত ধরেছে।

পরে অবশ্য গুজবটা অন্যভাবে পল্লবিত হল। সুরজিৎ রায় নাকি শর্ত সাপেক্ষে ওই বিয়েতে অনুমতি দিয়েছিল। বিয়ে করুক, কি নিকে, সুরজিতের প্রসাদ পেতে হলে দূরের প্রোগ্রামে গডফাদারের সঙ্গে এক গাড়িতে থাকতে হবে পিয়ালিকে। এবং সাহেবের সেখানে স্থান নেই। সে যাবে আলাদা। বাজনদারদের সঙ্গে। রাতে হোটেলবাসের ক্ষেত্রেও নাকি একই নীতি। সাহেবের জন্য ভিন্ন ঠাঁই।

তখন বিশ্বাস হয়নি। সাহেবের মতো ছেলে কি এমন বন্দোবস্ত হজম করতে পারে? ফুলশয্যার রাত থেকেই তো তা হলে লাঠালাঠি বেধে যেত। এখন ভাবলে মনে হয়, গুজবটা বোধ হয় মিথ্যে ছিল না। মাতালরা তো মানুষ হিসেবে এমনিই একটু সাদাসিধে প্রকৃতির হয়, সে জায়গায় আমাদের সাহেব তো খুব বেশি রকমের সোজা সরল। হয়তো বা ভালবাসার ঔদার্যে, কিংবা প্রেমের মোহে, চোখ বুজে ছিল সে। সাময়িকভাবে। হয়তো ধারণা ছিল, পিয়ালি আস্তে আস্তে সুরজিতের কবল থেকে সরে আসবে। কিন্তু তেমনটা ঘটল না বলেই ক্ষোভ, হতাশা এবং আবার বোতল। মাঝে পুচকুন হওয়ার আগে পরেও বছর দেড়েক মোটামুটি শান্ত ছিল সাহেব। মাস দুয়েক হল পিয়ালি ফিরেছে গানের দুনিয়ায়, প্রোগ্রাম রেকর্ডিং করছে পুর্ণোদ্যমে। বেড়েছে সুরজিতের সঙ্গে দহরম মহরম। সাহেব তো ফের খেপবেই। মদ না পেটে পড়া পর্যন্ত যতই সভ্যভব্য থাকুক না কেন, নেশার ঝোঁকে বুকের জ্বালা তো ফুটে বেরোবেই। গোদের ওপর বিষফোড়া, বেচারার হাতে এখন কাজকর্মও নেই। ভেতরে ভেতরে টগবগ ফুটলে গান আসে, না সুর আসে?

তাপস রিমোট টিপে ইংরিজি সিনেমায়। দোতলাও নিঝুম ক্রমশ। রণক্লান্ত সাহেব সম্ভবত ঝিমিয়ে গেছে। বুবলির ঘরেও আলো নিবে গেল।

আমারাও হাই উঠছিল। শোওয়ার ঘরে এলাম। টানটান হয়েছি বিছানায়। নাহ্, সাহেবকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে লাভ নেই, দোষের পাল্লাটা পিয়ালির দিকেই ঝুঁকছে বেশি।

কিন্তু এভাবে চলবে কদ্দিন?

তা অনেক দিনই চলল। প্রায় মাস ছয়েক। কখনও গড়িয়ে গড়িয়ে। কখনও বা টেনে-হিঁচড়ে। ঝগড়া বিবাদ তো প্রতি রাতেরই রুটিন ইভেন্ট এখন। কোনও দিন মাত্রা চড়ে তো কোনও দিন নিচু পরদায় বাঁধা। তবে রোজ একচোট হবেই হবে, এ আমরা বুঝে গেছি। যদি কোনও দিন সময় মতো কাজিয়া না বাধে, আমাদেরই কেমন গা ম্যাজম্যাজ করে, ঘুম আসতে চায় না। বুবলি পর্যন্ত উশখুশ করে। আচমকা প্রশ্ন করে বসে, কাকু-কাকিমা

www.boiRboi.blogspot.com

কি আজ বাড়ি নেই? তারপর হঠাৎ বেশি রাত্রে সাহেব মেমসাহেব ঝঙ্কার বেজে উঠলে আমি আর তাপস চোখ চাওয়াচাওয়ি করি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। অথবা দীর্ঘশ্বাস। অন্য একটা পরিবারের অশান্তি কখনও যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে, ভেবে বিস্মত হই।

তবে দিনেরবেলাটা কিন্তু ভারী অন্যরকম। তখন গৃহে শান্তিই শান্তি। পুচকুন ছাড়া আর কারও গলা উচ্চগ্রামে ওঠে না তখন। মাঝে মাঝে কানে আসে ছেলেকে গান শেখাচ্ছে সাহেব। প্রায়শই সাড়ে দশটা এগারোটায়, কিংবা তার কিছু আগে-পরে, সেজেগুজে বেরিয়ে যায় পিয়ালি। হয়তো রিহার্সাল। হয়তো রেকর্ডিং। কিংবা হয়তো নিছকই কোনও অন্য কাজ। পিয়ালি এখন কাজে ভাসছে। পিয়ালি কাজে ডুবে আছে। কখনও সখনও পুচকুনকে কোলে করে সাহেব তার সঙ্গে যায় মোড় পর্যন্ত, তারপর বাচ্চার হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা করতে করতে ফিরে আসে। বিকেলেও বেরোয় ফুটফুটে ছেলেটাকে নিয়ে। পার্ক, রাস্তা, চায়ের দোকান, সর্বত্রই পুচকুন তার সঙ্গী। এক-আধ দিন, নিতান্তই কালেভদ্রে, গিটারের বাক্স হাতে বেরোতে দেখা যায় সাহেবকে। রাস্তায় নেমে অনেকক্ষণ ধরে টা টা করে ছেলেকে। মুখোমুখি পড়ে গেলে আমাদের সঙ্গেও দু-চার কথা বলে, কুশল প্রশ্ন করে। আগের মতোই। এত নম্র স্বর, অথচ এই ছেলেই রাতে দানব....কী করে যে হয়? মেলে না, হিসেব মেলে না।

হঠাৎই এক দুপুরে কবিতাদি এল নীচতলায়। পুচকুনকে নিয়ে। ইদানীং কবিতাদির আসা-যাওয়া অনেক কমে গেছে, আমি তাই কিঞ্চিৎ অবাক।

হালকাভাবে বললাম,—নাতিকে নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন, অ্যাঁ? দোতলা থেকে আর নামারই সময় পান না!

কবিতাদি ম্লান হাসল। আগের মতো চেহারায় আর জৌলুস নেই, কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখায়। কপালে বলিরেখা ফুটে বেরিয়েছে, রোগাও লাগে খুব। সাহেবের বিয়ের পর যেন দুম করে বুড়িয়ে গেল।

পুচকুনকে আমার কোলে দিয়ে কবিতাদি বলল,—সত্যিই সময় পাই না

গো। পুচকুনকে স্নান করানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, ঘুমোলে তার কাছাকাছি থাকা....। ছেলের মা তো জন্ম দিয়েই খালাস, সব দায়দায়িত্ব এখন আমার ঘাড়ে।

—এ তো সুখের দায়, কবিতাদি।

—আর সুখ! কবিতাদি ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল,—সুখ বস্তুটি আমার কপালে নেই, এ আমি বুঝে গেছি। অসুখ নেই, বিসুখ নেই, রোগী দেখতে দেখতে পুট করে জ্বলজ্যান্ত মানুষটা মরে গেল। কীই বা বয়স হয়েছিল তার? পঞ্চান্ন। তারপর থেকে তো...। ভেবেছিলাম, ছেলে বিয়ে করলে সংসারটা একটু হাসিখুশি হবে। কপালের লিখন যাবে কোথায়, জুটল এক বজ্জাত বউ। ঘরসংসার আরও ঝালাপালা করে দিল।

কথাগুলো ঠং করে বাজল কানে। কবিতাদির কণ্ঠে এমন হতাশার সুর শুনিনি কখনও। কারও নিন্দেমন্দও না। পিয়ালির ব্যাপারে তো রীতিমতো পঞ্চমুখ ছিল! নাহ্, কবিতাদি সত্যিই খুব ভেঙে পড়েছে।

কবিতাদি বলেই চলেছে,—তোমাদের আর কী লুকোব, চোখের সামনেই তো দেখছ সব। পিয়ালি তো এখন কথায় কথায় হেনস্থা করছে আমার সাহেবকে। উঠতে বসতে টিজ। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি খোঁচা। পুচকুনকে নিয়ে যে আহ্লাদ করে বেরোচ্ছ, ট্যাকে পয়সা আছে তো? লজেন্স ললিপপ চাইলে কিনে দিতে পারবে? নাকি এক টাকা, দু টাকা, দিয়ে যাব? ...ভাবো তুমি, ছেলেটার এখন তেমন রোজগারপাতি নেই, কোথায় তার সঙ্গে একটু সিমপ্যাথেটিক ব্যবহার করবি, তা নয়...। ঘরে দুটো পয়সা আনে বলে বড্ড গুমোর। তাও যদি না জানতাম কোত্থেকে কী হচ্ছে!

কবিতাদির মুখ থেকে এত নিন্দাবাদ ভাল লাগছিল না। পুচকুনকে নামিয়ে খাটে বসালাম। বুবলির একটা পুরনো খেলনাগাড়ি হাতে ধরিয়ে দিয়ে কবিতাদিকে বললাম,—যাই বলুন, আমাদের পুচকুন কিন্তু দারুণ মিষ্টি হয়েছে। একেবারে দেবশিশু। প্রসঙ্গ ঘুরল না। কবিতাদি আবার একটা তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল,—ওকে দেখেই তো আমার আরও কষ্ট হয়। অত সুন্দর একটা শিশু,

www.boiRboi.blogspot.com

তার দিকেও কি সেভাবে ফিরে তাকায় বউটা? এই তো সে দিন ছেলেটার গা ছ্যাঁকছ্যাঁক, দেখেও মা দিব্যি নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। ভিডিও অ্যালবাম হচ্ছে, উনি মাঠেঘাটে ঘুরে ঘুরে তার শুটিং করবেন। সাহেবটা বোকার ডিম, সে আবার সোহাগ দেখিয়ে বউকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল। রাতে যার সঙ্গে লাঠালাঠি, দিনে তার ওপর অত সোহাগ কী করে জাগে আমি বুঝি না।

হেসে বললাম,—ওটাই আজকালকার ভালবাসা, কবিতাদি।

কখনও হাতে তলোয়ার, তো কখনও গোলাপফুল। সাহেব আর পিয়ালিও এইভাবে লড়ে লড়ে কাটিয়ে দেবে জীবনটা।

কবিতাদির মুখ ভার হল,—পিয়ালি কীভাবে জীবন কাটাবে জানি না। তবে আমার ছেলেটার জীবনটা যে নষ্ট করে দিল, এ আমি খুব টের পাই।

গভীর যন্ত্রণা থেকেই হয়তো উৎসারিত হল অভিযোগটা। কিন্তু আমার কেন যেন হাসি পেয়ে গেল। সাহেবের জীবন কি শুধু বিয়ের পর নষ্ট হয়েছে? পাড়ার লোকেরা তো বলে, মায়ের আদরে আদরে বহুকাল আগেই বিগড়েছে সাহেব। সীতাংশু ডাক্তার রোগী চেম্বার নিয়ে ব্যস্ত, সংসারের দিকে তাকানোর ফুরসত নেই, ও দিকে তার বউ যথেচ্ছ লাই দিয়ে চলেছে ছেলেকে। মুখ থেকে আবদারটুকু খসলেই হল, যা চাই হাজির। দামি দামি জামা জুতো, টেপ, ওয়াকম্যান, সানগ্লাস, পারলে আকাশের চাঁদও। সঙ্গে কাঁচা পয়সা তো আছেই। এ ছেলের পরিণাম কি ভাল হতে পারে? কুসঙ্গের কৃপায় নাইন টেন থেকেই ড্রাগের খপ্পরে পড়ল সাহেব, ঘষটে ঘষটে স্কুল টপকে ইতি টানল পড়শোনায়। ডাক্তারবাবু বেঁচে থাকতে বার দুয়েক নাকি নেশা ছাড়ানোর হোমেও রাখা হয়েছিল ছেলেকে। লাভের মধ্যে লাভ, ছিল শুকনো নেশা, ধরল তরল। ওই সময়ে কে তাকে জুগিয়েছে বোতলের পয়সা? কবিতাদি কি সব ভুলে গেল? নাকি নিজের অপরাধের বোঝা বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে সান্ত্বনা খুঁজছে মনে মনে? কিংবা হয়তো পিয়ালির ওপর খুব বেশি ভরসা করেছিল, আশাভঙ্গের জ্বালায় ছটফট করছে এখন!

কোনও মন্তব্য করলাম না। কবিতাদি আরও খানিকক্ষণ বকবক করল একটানা। ঘুরে ফিরে একই কথা। পিয়ালি কত নির্লজ্জ, সুরজিতের সঙ্গে ঢলাঢলিটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, আত্মীয়মহলে পিয়ালিকে নিয়ে কেমন ঢিঢি পড়ে গেছে, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ শুনতে শুনতে আমারও বেশ রাগ হচ্ছিল পিয়ালির ওপর। কেন মিছিমিছি লোক দেখানো বউ সেজে থাকা, এবার মানে মানে কেটে পড়লেই তো পারে।

অবশেষে দিনটা এল। সন্ধে থেকেই সে দিন তুলকালাম কাণ্ড। প্রথমে নিয়ম মাফিক ঠাঁইঠকাঠক, তারপর দুমদাম। টেবিল পড়ছে, চেয়ার ভাঙছে, কাপ ডিশ হাতা খুন্তি, কী যে ছোড়াছুড়ি চলছে কে জানে! তার মাঝেই সাহেবের গাঁক্‌গাঁক্, পিয়ালির চিলচিৎকার। হঠাৎ হঠাৎ কবিতাদির স্বরও শোনা যায়। সঙ্গে পুচকুনের কান্না।

তাপসকে বললাম,—আজ মনে হচ্ছে একটু বেশি বাড়াবাড়ি?

—হুম। কবিতাদিও যুদ্ধে জয়েন করেছে। পিয়ালির কপালে দুঃখ আছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সিঁড়ির দরজায় গুমগুম ধাক্কা। পাল্লা খুলতেই হুড়মুড় ঢুকে পড়েছে কবিতাদি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—এই, তোমরা একটু চলো প্লিজ। সাহেবকে একদম রোখা যাচ্ছে না।

লড়াই থামাতে আমরা একেবারেই যে যাই না, তা নয়। লাগাতার চলতে থাকলে এক-আধ দিন তো নাক গলাতেই হয়।

পারতপক্ষে বোবা কালা সেজে থাকারই চেষ্টা করি। বিশেষ করে তাপস তো মোটেই ঝুটঝামেলায় ভিড়তে চায় না।

আমাদের ইতস্তত ভাব দেখে কবিতাদি আবার বলল,—তোমরা কেউ না এলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সাহেব আজ মারধর করছে, তোমরা না আটকালে...

এটা নতুন সংযোজন। সাহেব তেড়ে তেড়ে যায় বটে, কখনও হাত চালায় না! মাকে হয়তো একদিন মারতে তাড়া করেছিল, পিয়ালিকে তো পেটায়নি কোনও দিন! জিনিসপত্র ভাঙচুর করা অবধিই তার দৌড়। আজ

www.boiRboi.blogspot.com

সীমা লঙ্ঘন করল যে বড়? প্রশ্ন করার সময় নেই, দুদ্দাড়িয়ে ছুটলাম ওপরে। গিয়ে দেখি গোটা বাড়িই প্রায় লণ্ডভণ্ড। ভেতর বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভাঙা কাপ ডিশ, ফুলদানি, ছবির ফ্রেম, মোবাইল ফোন, পিয়ালির ভ্যানিটি ব্যাগ, হেয়ারড্রায়ার, লিপস্টিক, আইলাইনার, নেলপলিশ, ব্রাশ...। সাহেবদের ঘরটার তো অকহতব্য দশা। ড্রেসিংটেবিলের টুল উলটে আছে দরজার সামনে, টেবিল কেতরে পড়েছে দেওয়ালে, চেয়ারটাকে তো দেখাই যাচ্ছে না, মেঝেয় বিছানা বালিশ ছত্রাকার, একখানা সুটকেস আর পিয়ালির একগাদা শাড়ি সালোয়ার লুটোপুটি খাচ্ছে যেখানে সেখানে। দামি মিউজিক সিস্টেমটারও লাথি ফাতি খেয়ে কী হাল।

এত সব কিছুর মধ্যিখানে কপালে হাত চেপে বসে আছে পিয়ালি। ঝামর ঝামর চুল, কাজল ধেবড়ানো চোখ, মূল্যবান কামিজের কাঁধ ছিড়ে ফরদাফাই। কপাল তার সত্যিই খারাপ, রক্ত ঝরছে কপাল বেয়ে।

সাহেবও ঘরেই মজুত। পা টলমল, কিন্তু তর্জনী তুলে গর্জে চলেছে জান্তব ভাষায়। নেশায় লাল চোখ দুটো ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন।

আমাদের দেখেই সাহেবের তেজ বুঝি বেড়ে গেল আচমকা। দু হাত ছড়িয়ে বলল,—দিয়েছি আজ শালির মাথা ফাটিয়ে। আমার সঙ্গে তিকড়মবাজি, অ্যাঁ?

পিয়ালি কপালে হাত চেপেই ফুঁসে উঠল,—কিসের এত রুস্তমি দেখাচ্ছ, শুনি? তিন পয়সার মুরোদ নেই, তিন টাকার ঝাল! আমি তোমার থোড়াই পরোয়া করি!

—অ্যাই শালি, চোপ। আর একটা কথা বললে গলা টিপে মেরে দেব।

—আর একবার গায়ে হাত তুলে দ্যাখ্।

তোর কোমরে যদি দড়ি না পরাই...! তোর মতো একটা কুত্তার ভুকভুকানিতে আমি চুপ করব? যা ভাগ্। ফোট্। তুই আমায় খাওয়াস, না পরাস? আমি তোকে পুষছি, বুঝলি, আমি তোকে পুষছি।

—কী? কীই?

সাহেব প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি, তাপস দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরল তাকে,—কী হচ্ছে কি সাহেব? চলো, বাইরে চলো।

—আমি কেন যাব? ওই ছেনালটা বেরিয়ে যাক। তিন দিনের জন্য ইয়ে মারাতে যেতে চাইছিল না? চিরদিনের জন্য যাক।

—শুনছ বউদি? শুনছ মুখের ভাষা? পিয়ালি আমায় সাক্ষী মানল, —শিলিগুড়িতে প্রোগ্রাম করতে যাব, শুনেই বাবু হিংসেয় জ্বলছে। আশ্চর্য, নিজে বেকার বলে আমাকেও কাজকর্ম করতে দেবে না? তাপসের টানে সাহেব দু পা হঠেছিল, ফের ছ-ফুটি দেহটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—যা না মাগি, কর না যা খুশি। তবে এ বাড়িতে আর পা রাখবি না, বলে দিলাম। আজ মাথায় অ্যাশট্রে ভেঙেছি, এরপর হাতুড়িপেটা করে ঘিলু বের করব।

—আমার বয়ে গেছে আর এখানে ফিরতে। দয়া করে তোর সঙ্গে থাকতাম, বুঝলি! নেশা ছুটলেই তো পায়ের কাছে লু লু করিস। লজ্জাও করে না। থু থু।

বলেই উঠে দাঁড়িয়েছে পিয়ালি। কপালের রক্ত হাতের চেটোয় মুছল ঘষে ঘষে। একবার দেখল হাতখানা। কামিজের ছেঁড়া কাঁধটাও। কামিজেই হাত মুছে সটান গিয়ে আলমারি খুলল। উলটোনো সুটকেসখানা সোজা করে ঝপাং ঝপাং জামাকাপড় পুরছে তাতে। সাহেবকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে তাপস, আমি আর কবিতাদি দরজায় নীরব দর্শক।

পিয়ালির দাপাদাপি দেখতে দেখতে হঠাৎই কবিতাদি বলে উঠল,—কী করছ তুমি? এক্ষুনি চললে নাকি?

কটমট চোকে শাশুড়ির দিকে ঝলক তাকাল পিয়ালি, জবাব দিল না। মেঝেয় ছড়ানো পোশাকআশাক তুলছে এবার।

কবিতাদি মিনমিন করে বলল,—মাথা ঠান্ডা করো পিয়ালি। যেতে হয়, কাল সকালে যেও।

www.boiRboi.blogspot.com

—কেন? আমার কপাল ফাটায় আপনার সুখ হয়নি বুঝি? চান রাত্তিরবেলা আমি খুন হয়ে যাই?

—ছি ছি, কী বলছ! রাগের মাথায় একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে...!

—উঁউঁউঁহ্, একদিন! শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন না। রোজই যে আমার কপাল ফাটে না, এ আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি।... কোত্থেকে যে একটা অমানুষের জন্ম দিয়েছিলেন!

—ভাষা ঠিক করো, পিয়ালি। গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলতে শেখো।

—গুরুজন দেখাবেন না। বাক্স গোছানো থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছে পিয়ালি। আঙুল নেড়ে কবিতাদিকে দেখিয়ে বলল,—বউদি, এই মহিলাটিকে চিনে রাখুন। এঁকে দেখে যেমনটা মনে হয়, মোটেই ইনি সেরকম নন। পেয়ারের ছেলেকে ইনিই দিনরাত তাতান। বউয়ের নাম যশ সহ্য করতে না পেরে ইনিও জ্বলেপুড়ে মরছেন।

কবিতাদির দু চোখ বিস্ফারিত। মুখে বাকি সরছে না। আমি ধমকে উঠলাম,—কী যা তা বলছ?

—ঠিকই বলছি। মা নেই বলে প্রথম প্রথম এসে খুব মা মা করতাম তো! উচিত শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে। আপনারাও একদিন ওঁকে চিনবেন।

ঘটাং ঘটাং সুটকেস বন্ধ করল পিয়ালি। টেনে টেনে নিয়ে সিঁড়ির মুখে। তারপর সুড়ুৎ করে ঢুকে গেছে শাশুড়ির ঘরে। পুচকুন ভ্যাবলার মতো ঠাকুমার বিছানায় বসে। খপাৎ করে তাকে কোলে তুলে নিল। গটগট বেরিয়ে যাচ্ছে।

কবিতাদি হাউমাউ করে ছুটে গেল,—করছ কী? পুচকুনকে নিয়ে চললে কোথায়?

পিয়ালি কেটে কেটে বলল,—আমি যেখানে থাকব, পুচকুনও সেখানে থাকবে।

—কক্ষনও না। পুচকুন আমার কাছে থাকে...

—তাতেই তো আপনি ওর মা হয়ে যাননি!

সাহেবকে মোটামুটি ঠান্ডা করে বাইরের ঘরে বসিয়েছিল তাপস, মা বউয়ের উত্তেজিত সংলাপ কানে যেতে আবার সে রে রে তেড়ে এসেছে। গর্জে উঠল,—খবরদার। পুচকুনকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। ও এই বাড়ির ছেলে, এখানেই থাকবে।

—এখন কেন , অ্যাঁ? একটু আগেই তো চেল্লাচ্ছিলে, পুচকুন তোমার ছেলে নয়। আমি নাকি অন্য কারও সঙ্গে শুয়ে পেট বাধিয়ে এসেছিলাম!

পলকের জন্য ধমকাল সাহেব। পর মুহূর্তে ফেটে পড়েছে,—বেশ করেছি বলেছি। শোও না তুমি ওই শুয়োরটার বিছানায়?

—হাজার বার শোব। লক্ষ বার শোব। পুচকুনকেও নিয়ে যাব। দেখি কী করে আটকাও।

—তবে রে মাগি...! দে, আমার ছেলে দে। তোর খানকিপনা আজ যদি না ঘুচিয়েছি...

ইস্, এবার তো কানে আঙুল দিতে হয়ে। দেড় বছরের বাচ্চাটাকে নিয়ে দুজনে হেঁচড়াহেঁচড়ি করছে, এ দৃশ্যও তো চোখে দেখা যায় না।

অসহায়ভাবে কবিতাদিকে বললাম,—আপনি তো ওদের মতো পাগল হয়ে যাননি, ছেলেকে থামান। এরপর তো থানাপুলিশ হয়ে যাবে। অতটুকু শিশু মায়ের কাছেই থাকবে, আইন আদালত কেউ আটকাতে পারবে না।

জোরজার করে সাহেবকে সরাতে কালঘাম ছুটে গেল। ছেলে কোলে সুটকেস হাতে, শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করল পিয়ালি।

সাহেব ঘাড় লটকে বসে পড়েছে সোফায়। কবিতাদি নিথর। আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। খানিকক্ষণ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে নেমে এলাম নীচে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। তাপস মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বল,—উফ্, ঝড় না ঝড়! আমায় এক গ্লাস জল খাওয়াও তো।

বুবলি জুলজুল চোখে আমাদের দেখছিল। বড় হচ্ছে, বারো পুরে তেরোয়, সবই বুঝতে পারে এখন। ছুটে ফ্রিজ থেকে জল এনে করুণ মুখে বলল,—পুচকুনকে নিয়ে গেল?

www.boiRboi.blogspot.com

গোমড়া মুখে বললাম,—হুঁ।

—কাকিমাটা ভীষণ পাজি। বেচারি দিদা এখন কী নিয়ে থাকবে?

তাপস জল শেষ করে বলল,—কেন, তোর দিদার গুণধর ছেলে তো রইল।

মেয়ের সামনে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—হ্যাঁ, মায়েরও কপাল ফাটল। এবার কবিতাদিকেই তো আবার দুরমুশ করবে সাহেব।

মানুষ এক আজব জীব। কখন যে তার মতি পালটায়, কীভাবে যে স্রোতের মুখ অন্য দিকে ঘুরে যায়, তা বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন। কিছুতেই হিসেব মেলানো যায় না।

সেই রাতের পর থেকে সাহেব একেবারে অন্যরকম। উদাস মুখে ঘুরে বেড়ায়, কারও সঙ্গেই কথা বলে না বড় একটা। মদ খাওয়া পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি, কিন্তু হল্লাগুল্লা আশ্চর্যরকমভাবে বন্ধ। মাতাল হলেও টের পাওয়ার উপায় নেই। রাতের দিকে টুং টাং গিটার বাজায় মাঝেসাঝে, অথবা সুর তোলে সিন্থেসাইজারে। নয়তো দোতলার বারান্দায় বসে থাকে নিঝুম।

কবিতাদি তো ছেলে নিয়ে রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেছে। প্রায়ই এসে আক্ষেপ করে,—কাজটা কিন্তু ন্যায় করল না পিয়ালি।

পুচকুনটাকে কেড়ে নিয়ে গেল! দেখছ তো, সাহেবের কী দশা! গুম হয়ে থাকতে থাকতে ছেলেটা পাগল টাগল না হয়ে যায়।

সাহেব কি শুধুই পুচকুনের শোকে কাতর? নাকি পিয়ালি বিহনেও? কিন্তু কবিতাদি যে নাতির সঙ্গে বিচ্ছেদটা কোনওভাবেই মন থেকে মানতে পারছে না, এ তার চেহারাতেই প্রকট। বয়স যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কেমন শীর্ণও হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কবিতাদিকে দেখে যেন বেশি মায়া জাগে।

একদিন বলেই ফেললাম,—সাহেবকে সরাসরি যেতে বলুন না। পুচকুনকে এক-আধ দিন নিয়ে আসুক। তাকে দেখার রাইট তো আপনাদের আছে।

কবিতাদি ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—পিয়ালি ও সব মানে নাকি? সাহেব তো মান খুইয়ে তার কাছে গিয়েছিল, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—পিয়ালি এখন কোথায়? সেই বজ্জাতটার সঙ্গে?

—না না, বাপের বাড়িতে।

—তা আপনি সেখানে একবার ফোন করুন না। পিয়ালি না হোক, তার বাপ-দাদাদের বুঝিয়ে বলুন।

—সে চেষ্টা কি করিনি? ওরা কথাই বলে না। আমার নাম শুনলেই লাইন কেটে দেয়।

—ভীষণ অসভ্য তো। সাহেবকে বলুন উকিলের চিঠি দিতে। বাপ বাপ বলে ছেলে দেখিয়ে যাবে।

—নাতির জন্য শেষে কোর্টকাছারি করব?

তা কবিতাদির দ্বিধা থাকলেও আদালতে যেতেই হল শেষ পর্যন্ত।

পিয়ালি নোটিস পাঠাল ডিভোর্সের। ঐ দিকে আমাদেরও বাড়ি তৈরি শুরু হয়ে গেছে, সকাল বিকেল ছুটতে হচ্ছে গড়িয়ায়। হয় আমি যাই, নয় তাপস। একজন কেউ না দাঁড়ালে কন্ট্রাক্টর কাজে ঢিল দেবে, দু নম্বরি মালমশলাও চালাবে দেদার। মধ্যবিত্তের ঘরবাড়ি, এ তো প্রায় স্বপ্নপূরণ। নিজেই ঘুরে ঘুরে ইট বালি লোহা কিনছে তাপস। তবু শত ব্যস্ততার মাঝেও উকিলের কাছে নিয়ে গেল সাহেবকে। লড়ালড়ি করেও পুচকুনের দখলদারি পেল না বেচারি। একে পুচকুন পাঁচ বছরের কম, তার ওপর সাহেবের রোজগার মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয়, মোদো মাতাল বলেও সে সুবিদিত। অতএব পুচকুনের ভার যে পিয়ালিতেই বর্তাবে, এ তো অবধারিত। পিয়ালির ব্যভিচারের ব্যাপারটা কে জানে কেন আদালতে তুলতে চায়নি সাহেব। তুললেও ধোপে টিকত কি না সন্দেহ। প্রমাণ কোথায়?

যাই হোক, ঘন মেঘে একটাই রুপোলি রেখা। কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সপ্তাহে একদিন বাবার কাছে যাবে পুচকুন। এইটুকুই বা কম কী?

www.boiRboi.blogspot.com

শনি রবি নয়, সপ্তাহের মাঝে কোনও একটা দিন পিয়ালি নিজেই পৌঁছে দিয়ে যায় পুচকুনকে। নিজের বেশি কাজের দিনগুলোই সম্ভবত বেছে নেয়। কিনেছে না পেয়েছ কে জানে, আসে একটা মারুতি হাঁকিয়ে। কায়দা করে চুল ছেঁটেছে, চোখে দামি সানগ্লাস। গাড়ি থেকে নামে না কক্ষনও, ড্রাইভারকে দিয়ে তিনবার প্যাঁক প্যাঁক হর্ন বাজায়, ছেলে বাড়িতে ঢুকে গেলে বেরিয়ে যায় হুশ করে। রাতে পুচকুনকে তুলতে ড্রাইভারই আসে শুধু, গাড়িতে ক্বচিৎ কখনও পিয়ালিকে দেখা যায়।

বেশ একটা কেউকেটা কেউকেটা ভাব এসেছে পিয়ালির। কায়দা মেরে বসে থাকে পিছনের সিটে। একদিন জানলা থেকে ভদ্রতা করে একটু হেসেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে কালো চশমা ঢাকা মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। যেন মিলিবউদিকে সে চেনেই না।

চিনলি না তো চিনলি না, মিলিবউদির তাতে বয়েই গেল। আমি আজকাল হর্ন শুনলেই বন্ধ করে দিই জানলা। শব্দ করে।

নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি প্রায় দেড় বছর। প্রথম কটা মাস তো গোছগাছ করতেই কেটে গেল। এটা কিনছি, ওটা কিনছি...

আলমারি একবার এ দেওয়ালে রাখি, তো একবার ও দেওয়ালে, খাটবিছানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি বার বার। একটা ঘরে মোজাইক বাকি ছিল, ছাদের সিঁড়িতে আধাখোঁড়া, ঢোকার পরে শেষ করতে হল কাজগুলো। টুকটুক করে সাজিয়েও ফেললাম বাড়িখানা। অ্যাদ্দিনে মনে হচ্ছে থিতু হয়েছি মোটামুটি। শহরের মধ্যমণি অঞ্চল থেকে প্রায় শহরতলিতে চলে এসে বুবলির মনখারাপ হয়েছিল খুব। এখন দিব্যি সয়ে গেছে। এ-পাড়াতেই এখন তার কত বন্ধুবান্ধব। তাপসের অবশ্য এখনও একটু খুঁতখুঁতনি আছে, অফিসটা দূরে হয়ে গেছে কি না।

কবিতাদির সঙ্গে আর তেমন যোগাযোগ নেই। গোড়ার দিকে ফোনাফুনি চলত বেশ, কবিতাদি বাড়িটা দেখেও গেছে। তারপর আস্তে আস্তে কীভাবে যেন সুতোটা ঢিলে হয়ে গেল। এখন ন মাসে ছ মাসে ফোন, কেমন আছেন,

ভাল আছি, ব্যাস। নতুন বাড়ি, নতুন পাড়া, বুবলি, সংসার নিয়ে এমন মজে আছি, ভবানীপুরের বাড়িটার সেই কলহ অশান্তির কথা আর মনেই পড়ে না সেভাবে। উঁহুঁ, আসে স্মরণে। হঠাৎ হঠাৎ। পিয়ালির দৌলতে। পিয়ালির এখন ভালই নামডাক। নক্ষত্র না হলেও সে এখন একজন সেলিব্রিটি। এফ-এম চ্যানেলে পিয়ালির আধুনিক গান শোনা যায়, টিভির পরদায় দেখা যায় তার ভিডিও অ্যালবাম। হড়কা বানের মতো স্মৃতিগুলো ধেয়ে আসে সহসা। ঝপ করে রেডিও-টিভি বন্ধ করে দিই। হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে তাপস বলল,—তোমাকে একটা স্কুপ দিতে পারি, বুঝলে। সাহেবের এক্স-ওয়াইফ নাকি ঠাঁই বদল করেছে।

হেসে বললাম,—তুৎ, ও খবর তো ঠোঙা। বাপের বাড়ি ছেড়ে সুরজিতের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে তো...?

—আরে বাবা, না। সুরজিৎ রায়ও এখন পাস্ট টেন্স। শি হ্যাজ লেফট হিম।

—সে কী? কেন? কবে? কোথায় আছে এখন?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, একবারে অত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় নাকি? সুরজিৎকে ছাড়ার এগ্‌জাক্ট দিনক্ষণ আমি বলতে পারব না। তবে ছেড়েছে। আমাদের অফিসের দীপেনের ভাই তো রেকর্ডিং স্টুডিওয় চাকরি করে, সেই ঘোড়ারই মুখের খবর। সুরজিৎকে নাকি বিয়ের জন্য খুব চাপাচাপি করছিল পিয়ালি...তা সে তো মহা ঘোড়েল, নিজের বউ বাচ্চাকে সে ছাড়বে না... তাই নিয়ে দুজনের হেভি ফাটাফাটি। দীপেনের ভাইদের স্টুডিওতেই নাকি সুরজিৎ আর পিয়ালি একদিন ফ্রি শো দেখিয়েছে। বক্সিংয়ের। ব্যস্, তার পরেই কাট্টি। বাক্সপেঁটরা গুছিয়ে পিয়ালি এখন অন্য নৌকোর ছইয়ে। বিদ্যুৎ ভট্‌চাজ...ওই যে ফিল্মে মিউজিক টিউজিকদেয়...তার সঙ্গে লিভটুগেদার করছে।

বিজাতীয় উল্লাস হল শুনে। বললাম,—জানতাম ওই মেয়ের এই গতিই হবে। ঘাটে ঘাটে জল খেয়ে বেড়াতে হবে এবার।

www.boiRboi.blogspot.com

—অত সোজা ইকুয়েশনে যেও না। তাপস গুছিয়ে বসল, —পিয়ালি অত্যন্ত চালু। মেপেজুপেই এগোচ্ছে। সুরজিৎকে ওর নিংড়ানো কমপ্লিট। পরিচিতির দরকার ছিল, সুরজিৎ সেটা ওকে পাইয়ে দিয়েছে। পিয়ালির যা ক্যালি, তার চেয়ে বেশ খানিকটা ওপরেই ওকে ঠেলে দিয়েছে। পাম্প মেরে মেরে ওকে তো আর লতা মুঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখার্জি বানানো যাবে না। অথচ পিয়ালি মার্কেটে টিকে থাকতে চায়। সে দিক দিয়ে ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর তো আইডিয়াল চয়েস। তাই বিয়ের বাহানায় সুরজিৎ আউট, বিদ্যুৎ ইন। ভট্‌চাজের পো ওকে ব্রেক দিতে পারল ভাল, নইলে আর কাউকে ধরবে।

—আর পুচকুন? সে এখন কোথায়?

—মার সঙ্গেই আছে নিশ্চয়ই।

—পাঠায় ও বাড়ি?

—কী করে বলব? হয়তো পাঠায়।

—পুচকুনটাও মানুষ হবে না। কেন যে জেদ করে ছেলেটাকে নিয়ে গেল!

—সাহেবের কাছে থাকলেও কি মানুষ হত?

লাখটাকার প্রশ্ন। উত্তর হয় না। একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে বললাম, —একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। পিয়ালি তো নিজের কেরিয়ার ছাড়া আর কিছুই বোঝে না... ওর মতো একটা অ্যাম্বিশাস মেয়ে সাহেবকে আদৌ বিয়ে করেছিল কেন? যখন ওই সময়েই সে সুরজিতের ঘাটে নোঙর ফেলে রেখেছে?

—ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। সাহেবের রূপ, ম্যাসকিউলিনিটি, ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তুলনায় সুরজিতের যা বদখৎ চেহারা!

—তার মানে সাহেবের ওপর প্রেমটা মোহ ছিল বলছ?

—তা ছাড়া কী! চোখের রং যখন ফিকে হল, তদ্দিনে সে প্রেগন্যান্ট।

এবং ওই মেয়ে যে তখন বাচ্চাটাকে নষ্ট করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেনি, এটাই পুচকনের ভাগ্য।

—কিংবা পুচকুনের দুর্ভাগ্য।

লঘু স্বরে বললাম বটে, কিন্তু বুকটা কেমন ভারী হয়ে গেল সহসা। পুচকুনের পাশাপশি কবিতাদির মুখটাও মনে পড়ল। নাতি যে দিন হল, অদ্ভুত এক আলো ছড়িয়ে পড়েছিল কবিতাদির মুখেচোখে। পিয়ালি আলোটা মুছে দিয়েছে। ছেলেটাকেও তো একটা বাজে পরিবেশে নিয়ে গেল। পুচকুন এখন যেভাবে আছে, কবিতাদির বাড়ির পরিবেশ তার চেয়ে খারাপ ছিল কী? কবিতাদির খুব আশা ছিল, নাতি বড় হয়ে ডাক্তার হবে। দাদুর মতো। ওই পিয়ালির ছায়ায় তা কি সম্ভব? বেচারা কবিতাদির কোনও মনস্কামনাই বুঝি পূর্ণ হওয়ার নয়।

নহ্, কবিতাদিকে মাঝে মাঝে ফোন করা উচিত। কারও সঙ্গে দুটো চারটে কথা বললেও তো মানুষের মন খানিকটা হালকা হয়। পরদিনই টেলিফোন করলাম। রিং বেজে গেল। কোথাও বেরিয়েছে কি? থাক, পরে দেখা যাবে।

কিন্তু যা হয়। গড়িমসি। কবিতাদিকে আবার ভুলে গেলাম। মাস দুয়েকও কাটেনি, হঠাৎ চরম দুঃসংবাদ। কবিতাদির নাকি ক্যানসার!

খবরটা এনেছে বুবলি। আমাদের আগের পাড়ার সংঘমিত্রা বুবলিদের স্কুলে পড়ে, তার কাছে শুনেছে আজ।

আমি হতভম্ব,—কবে হল? কী করে হল?

শুকনো মুখে বুবলি বলল,—বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি ভুগছিল।

পেটে ব্যথা, যখন তখন বমি, পটির সঙ্গে রক্ত পড়ছে...।

সাহেববাবু গোস্বামী ডাক্তারকে দেখাচ্ছিল। উনিই ক্যানসারের টেস্ট করতে বলেছিলেন। তখনই ধরা পড়ল...

—ও। এখন কী অবস্থা?

www.boiRboi.blogspot.com

—ভাল নয় বোধ হয়। হসপিটালে ভর্তি আছে। ঠাকুরপুকুরে। এই হচ্ছে ভাঙা কপাল। বাধল তো বাধল, একেবারে সম্রাটের রোগ। জলের মতো টাকাও বেরিয়ে যাবে এখন। কত আর সঞ্চয় আছে কবিতাদির? নিজস্ব বাড়িটুকু ছাড়া? সাহেব যে লাখ, দু লাখ জোগাড় করবে, সে ভরসাও তো করা যায় না। সর্বস্ব খুইয়ে চিকিৎসা করিয়েও পরিণাম তো প্রায় অবশ্যম্ভাবী!

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম সাহেবকে। বেজে গেল ফোন। রাতে করলাম, এবারও সাড়া নেই। সাহেব কি রাতে হাসপাতালেই আছে? নাকি টেলিফোন খারাপ? দুঃসময় তো একা আসে না, তখন একে একে সবই বিগড়োতে থাকে।

পরদিনই রবিবার ছিল। তাপস আর আমি ছুটলাম বিকেলে। হাসপাতালের লাউঞ্জে চেনাপরিচিত কাউকেই দেখতে পেলাম না। সাহেবকেও নয়। অগত্যা রিসেপশন কাউন্টার। জিজ্ঞেস করে হদিস মিলল কবিতাদির।

তাপস সরে আসছিল, পিছন থেকে কাউন্টারের মেয়েটি ডাকল,

—শুনছেন? আপনারা কি এখন পেশেন্ট দেখতে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কোনও অসুবিধে আছে?

—না, না একজন একটু আগে গেছেন। ওই যে গান করেন...পিয়ালি সেনগুপ্ত...

দু'জনেই জোর চমকেছি। পিয়ালি কবিতাদিকে দেখতে এসেছে? মেয়েটি আবার বলল,—ম্যাডামকে বলবেন, উনি বিল পেমেন্টের সময়ে ক্রেডিট কার্ডটা ফেলে গেছেন। এসে যেন নিয়ে যান।

এবার চমক নয়, ধাক্কা। ভুলভাল শুনছি না তো?

ওপরে ওঠা পর্যন্ত আমাদের দুজনেরই মুখে কোনও কথা ফুটল না। আট শয্যার ছোট ওয়ার্ডটিতে ঢুকেই আমাদের দু জোড়া পা'ই গেঁথে গেল মাটিতে। ফিডিং কাপে করে পিয়ালি কী যেন খাইয়ে দিচ্ছে কবিতাদিকে! পাশে সাহেব। সাহেবের কাঁধে ঝুলছে পিয়ালির ভ্যানিটিব্যাগ!

কী চমৎকার এক পারিবারিক দৃশ্য। সত্যিও বটে। আবার অলীকও বটে।

আমি আর তাপস মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। অস্ফুটে বলে উঠেছি, —কী বুঝছ?

তাপস দু দিকে মাথা নাড়ল,—হিসেব মেলে না। হিসেব মেলে না।

আপদ

ঘুমের মধ্যেই শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল বীথি। ডাইনিং স্পেসে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ক্যাঁচ করে চেয়ারে শব্দ হল একটা; স্টিলের গেলাস গড়িয়ে গেল!

কে? কে? ধড়মড় করে বীথি উঠে বসল বিছানায়। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল একটুক্ষণ। হ্যাঁ, আছে। নির্ঘাৎ আছে কেউ। পা ঘষে ঘষে এবার রান্নাঘরের প্যাসেজে যাচ্ছে। আবার ফিরল। এবার ফ্রিজ খোলার শব্দ!

বীথি ধাক্কা দিল সুজয়কে,—অ্যাই, শুনছ? তাড়াতাড়ি ওঠো। ওঠো না।

সুজয় ক্লান্তিহর ঘুমে নিমগ্ন। সামান্য নড়াচড়া করল মাত্র।

মশারির চালে ফেলা বেডসুইচটা হাতড়ে হাতড়ে জ্বালল বীথি। কাঁপা কাঁপা গলায় হাঁক পাড়ল,—কে? কে ওখানে?

আর শব্দ নেই।

বীথি এবার জোরে জোরে ঠেলল স্বামীকে,—শোন না... অ্যাই..... অ্যাই....ওঠো না.....

বার কয়েক ঝাঁকানোর পর সুজয় জেগেছে,—কী হল?

—কে যেন বাইরে আওয়াজ করছে। শোন..... শুনতে পাচ্ছ?

সঙ্গে সঙ্গে দুম করে একটা চেয়ার উল্টোনোর আওয়াজ।

www.boiRboi.blogspot.com

সুজয়ও লাফিয়ে উঠেছে—চোখ বড় বড়।

বীথি ফিসফিস করে বলল,—অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে।

—বেড়াল ঢুকেছে নাকি?

—কি করে ঢুকবে? চারিদিক তো বন্ধ!

—তাই তো!

মশারি তুলে খাট থেকে নামল সুজয়। পিছন পিছন বীথি। বেড়াল না ঢুকতে পারলে মানুষই বা ঢুকবে কী করে? দরজা জানলা ভাঙতে হবে তো তাহলে। এক যদি বাথরুমের স্কাইলাইট দিয়ে.....

শোওয়ার ঘরের সামনেই ডাইনিং স্পেস। উল্টো দিকে তুতু মিতুর ঘর। এক পাশে ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুমের মুখোমুখি সরু প্যাসেজ, রান্নাঘর, বাথরুম একেবারে কম্প্যাক্ট ফ্ল্যাট। দরজা ভেঙে না ফেললে কারুর পক্ষেই ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

পায়ে পায়ে গিয়ে ডাইনিং স্পেসের আলো জ্বালাল সুজয়। কই, কেউ নেই তো! এদিক ওদিক চোখ চালাল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না!

ঠিক তখনই বীথি আবিষ্কার করল মেয়েটাকে। ক্রকারি কেসের পাশে। ফ্রিজ কাচের আলমারির ফাঁকাটুকুতে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। বেস্পতি। সবে কাল দুপুরে কাজে লেগেছে বেস্পতি। বছর বারো বয়স। রোগা ডিগডিগে না খেতে পাওয়া চেহারা। গ্রাম থেকে সদ্য আগত।

বীথি সুজয় মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। দু এক মুহূর্ত। বীথিই এগিয়ে গেল দুপদাপ। উবু হয়ে বসেছে মেয়েটার সামনে,.....অ্যাই বেস্পতি.....অ্যাই.....কী রে.....এখানে এভাবে ঘুমোচ্ছিস কেন?

অবিরাম ঠেলা খেয়ে চোখ খুলল মেয়েটা। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি বীথির মুখের ওপর ঘুরল দু চার সেকেন্ড। তারপর আবার চোখ বুজেছে। কাঠির মতো শীর্ণ ঘাড় ঝুলে পড়ল। ঘুমে।

—ও মা, এ কী? ওঠ্, উঠে পড়। নিজের জায়গায় গিয়ে শুবি যা।

www.boiRboi.blogspot.com

মেয়েটার নিঃশ্বাস গাঢ়তর হল।

—আচ্ছা মুশকিল তো! অ্যাই মেয়ে, বিছানায় শুবি চল্।

এবার চোখ বন্ধ করেই উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। ঘুমন্ত চোখেই টলমল করে এগোল কয়েক পা।

সুজয় হাঁ হাঁ করে উঠল,—চোখ খুলে হাঁট্। পড়ে যাবি যে।

বেস্পতি চোখ খুললই না। টালমাটাল পায়ে ঠিক পৌঁছে গেল প্যাসেজে, নিজের জায়গায়। শতরঞ্চিতে দু হাঁটু মুড়ে কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে পড়েছে। বিড় বিড় করে বললও কী যেন। বলতে বলতেই ঘুমে কাদা।

ঘরে ফিরে বীথি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল,—বাবাঃ, যা ভয় পেয়েছিলাম!

সুজয়ও জল টল খেয়ে ঢুকেছে মশারিতে। বলল,—ও বিছানা ছেড়ে ওইখানটায় গিয়ে কেন শুয়েছিল বলো তো?

—কী জানি! নতুন জায়গা বলেই বোধহয়....। ঘুরছিল কেন ঘরময়?

—মনে হয় ভয় টয় পেয়েছে। প্রথম রাত তো..... দেশগ্রাম ছেড়ে, বাপ মাকে ছেড়ে.....

—হতে পারে। নিশ্চিন্ত সুজয় পাশ বালিস জড়াল আয়েস করে,—ভাল করে খোঁজ টোজ নিয়ে রেখেছ তো?

—গোপালের মা তো বলল ওর গ্রাম সম্পর্কের ভাইঝি। খুবই চেনা।

—হুম। দেখে তো মেয়েটাকে ইনোসেন্টই মনে হয়। যাক গে, এখন শুয়ে পড়ো।

সুজয় ফের নিদ্রায় ডুবে যাওয়ার পরও ঘুম আসছিল না বীথির। টিপ টিপ চিন্তা ঘুরছে মাথায়। মেয়েটা অন্ধকারে অমন চলে বেড়াচ্ছিল কেন? এমনিতে অবশ্য বেশ শান্তশিষ্ট, ভীতু ভীতু গোছের। গোপালের মা বলছিল বড় অভাবী। বাপ দিন মজুর খাটে, একদিন আয় করে তো দুদিন বসা। ছেলেমেয়ের সংখ্যাও তার নেহাত কম নয়। চার চারটে মেয়ের পর একটা বুঝি কোলের ছেলে আছে। এই মেয়ে হল গিয়ে দু নম্বর। বড় মেয়েটাকে

আগেই কোথায় কাজে দিয়েছে, এবার এটাকে....। কী করবে, খেতে দেওয়ার ক্ষমতা নেই, মেয়ে তাও বাবুর বাড়ি খেটে যদি দুচার পয়সা রোজগার করতে পারে। বীথি অবশ্য ভারী কাজ খুব একটা করাবে না মেয়েটাকে দিয়ে। এই হাতে হাতে লেগে থাকা, ফাইফরমাশ খাটা....। গোপালের মা বলছিল একশো টাকা করে অন্তত দিও। তা দেওয়াই যায়, যদি কাজকর্ম ঠিকঠাক শিখে নিতে পারে। আহা, গরীবের মেয়ে। তবে, হ্যাঁ, একটু চোখে চোখেও রাখা দরকার। গেঁয়ো ভূত হোক আর যাই হোক, রাতবিরেতে উঠে এরকম খাবার ঘরে ঘুরবে এটাও তো ঠিক নয়। বাড়ির জন্য মন কেমন করছিল কি? উঁহু, তা হলে অমন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয় কী করে? কাল মেয়েটার জন্য একটা মশারির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। হয়তো মশা কামড়াছিল বলেই....

পরদিনই ট্রাংক বাক্স ঘেঁটে বেস্পতিকে একটা পুরোন দেখে মশারি বার করে দিল বীথি। গায়ে দেওয়ার জন্য রঙ জ্বলে যাওয়া একখানা চাদরও। আহা, আরামে ঘুমোক।

কোথায় কী! একটা দিন যেতে না যেতে মাঝরাতে ফের আওয়াজ। সশব্দে চেয়ার সরছে এদিক ওদিক। ডাইনিং টেবিলের জগ উল্টে গেল।

বীথির সঙ্গে সুজয়েরও আজ ঘুম ছুটেছে। হুড়মুড় করে দুজনেই ঘরের বাইরে আলো জ্বেলে খুঁজল এদিক ওদিক। কী কাণ্ড, মেয়েটা তো নেই! বীথি দৌড়ে গিয়ে ক্রকারি কেসের পাশটা দেখল। নেই। পা টিপে টিপে প্যাসেজে গেল। বিছানা খালি। বাথরুমে ঢুকেছে? উঁহু, বাথরুম তো ফাঁকা! দ্রুত পায়ে বাইরের ঘরে এল স্বামী-স্ত্রী। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল না তো? ওফ্‌স নিশ্চিন্ত। দরজা যেমন বন্ধ তেমনই বন্ধ রয়েছে।

তাহলে? মেয়েদের ঘরে গিয়েছে কি?

যা ভেবেছে তাই। তুতু মিতুর ঘরের নীলচে অন্ধকারে অবিকল প্রেতাত্মার মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে বেস্পতি।

—কী রে, এখানে কী করছিস?

ছায়া নড়ল না একটুও। টিউব লাইট জ্বালাল সুজয়। ডবলবেড খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছে তুতু মিতু। তাদের বিছানার সামনে দণ্ডায়মান বেস্পতিও

www.boiRboi.blogspot.com

ঘুমন্ত। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করে ঘুমোয় মেয়েটা? সত্যি ঘুমোচ্ছে? নাকি ভান?

বীথি হিড়হিড় করে মেয়েটাকে টেনে আনল বাইরে। মেয়েটার চোখ যথারীতি বন্ধ, একটু ঠেলা দিতেই বিড় বিড় করে কী যেন বলে উঠল।

বীথি মেয়েটার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল,—কী বলছিস্ কী?

বাক্যগুলো স্পষ্ট নয়। তুব দু একটা শব্দ যেন বোঝা গেল।—বিছানা.... মা..... হাওয়া.... আদর.....!

বীথি ভুরু কুঁচকে তাকাল,—হয়েছে, যা। এবার নিজের জায়গায় যা।

আগের রাতের মতোই একটুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটা, তারপর চলতে চলতে বিছানায় ফিরে ধুপ করে শুয়েই ঘুমে অচেতন।

ঘরে ফিরে সুজয় চিন্তিত মুখে বলল,—কেসটা কী হচ্ছে বলো তো? মেয়েটা কি সমনম্‌বুলিস্ট? নাকি সম্‌নোএলোকয়েন্ট?

—মানে?

—মানে ওই যারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে, কথা বলে....। মেয়েটাকে আমার সমনম্‌বুলিস্টই মনে হচ্ছে।

—বলছ?

—হুঁ, এটা এক ধরনের ডিজিজও বলতে পারো। অনেকেরই হয়।

আজও বীথির ঘুম এল না আর। এ আবার কী ধরনের অসুখ মেয়েটার? এমনি তো সারাদিন দিব্যি থাকে চুপচাপ। শান্তশিষ্ট। মাঝে মাঝে বাড়ির জন্য মন খারাপ করে বটে, তবে হাসিখুশিও তো থাকে বেশ। টুকটাক কাজ শিখে যাচ্ছে। শেখার আগ্রহও আছে। তুতু মিতুর সঙ্গেও ভালই ভাব হয়ে গেছে। ওরা পড়তে বসলে সামনে বসে বাবু হয়ে। গ্রামে থাকতে নাকি ক্লাস থ্রি অবধি পড়েছিল। তুতু আজই তো ওকে ইংরিজি পড়াচ্ছিল।

তুতু মিতুর ঘরে কি শুতে ইচ্ছে হয়েছিল বেস্পতির? হতে পারে। কিন্তু তাহলে ওই সব বলছিল কেন? মা..... আদর..... বিছানা.....?

তুতু মিতুকে কি হিংসে করছে বেস্পতি? নিশ্চয়ই তাই।

এই তো তখন রাতে খেতে বসেছে তুতু মিতু, বেস্পতি টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে।

বীথি খুব বকছিল তুতুকে,—দুধটুকু খেয়ে নাও তুতু, ওটুকু দুধ তোমায় খেতেই হবে।

তুতু তবু মুখ বেঁকাচ্ছে,—প্লিজ মা, ভাল্লাগছে না।

—কোনও কথা নয়, ঢক ঢক করে খাও। একটুও ফেলবে না।

তুতু অসভ্যর মতো ওয়াক তুলল।

বেস্পতির হিন্দোলিয়ামের থালায় গোটা চারেক রুটি দিয়ে দিল বীথি, সঙ্গে তরকারি। এক টুকরো মাছও। বলল,—যা, তুইও খেয়ে নিগে যা।

বাধ্য মেয়ের মতো চলেই যাচ্ছিল বেস্পতি, হঠাৎই মিতু পাকামি করে বলে উঠল,—বেস্পতিকেও একটু দুধ দাও না মা।

সঙ্গে সঙ্গে তুতুরও অনুরোধ,—হ্যাঁ মা, দাও না। আমারটা দিয়ে দাও।

না'টা কি খুব বেশি জোরে বলে ফেলেছিল বীথি? বেস্পতির মনে কি তার জন্যই কোনও প্রতিক্রিয়া হয়েছে?

না। এবার থেকে একটু সাবধানে মেপে জুপে কথা বলতে হবে। যতই যাই হোক, মেয়েটা যে একেবারেই বাচ্চা, তুতু মিতুরই মতো, এ কথা তো মাথায় রাখা দরকারই।

পরদিন থেকে সত্যি সত্যিই বীথি সচেতন হয়ে রইল কটা দিন। বেস্পতিও রাতে আর কদিন উঠল না। সারাদিন লাফিয়ে লাফিয়ে কাজ করছে। হাতে হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ও মামী, আমি গ্যাস ধরানো শিখে গেছি গো। জলের বোতলগুলো কি ফিচে তুলে দেব মামী? স্যালাশ বানাব?

বেস্পতির ভাষায় যে কত অপভ্রংশ শব্দ! কত রকম বর্ণবিপর্যয়!

তুতু হেসে কুটিপাটি যায়,—ফিচ না রে বেস্পতি, বল্ ফ্রিজ। ফ্রিইইজ।

মিতু শেখায়,—স্যালাশ নয়, বল্ স্যালড।

www.boiRboi.blogspot.com

বেস্পতি যথাসাধ্য শোধরানোর চেষ্টা করে নিজেকে। রোগা মুখের কালো দুই চোখের তারা জ্বল জ্বল করে তখন। তুতু মিতু স্কুল থেকে ফিরলে মেয়েটা ওদের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে। ধীরে ধীরে বেস্পতি এ বাড়িতে দিব্যি মানিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। সুজয় নিশ্চিন্ত। বীথিও। এরকম একটা রাতদিনের কাজের মেয়ের বড় প্রয়োজন ছিল তাদের।

ও মা, মাস খানেকের মধ্যেই আবার রাত্রে বেস্পতির উপদ্রব। একদিন নয়, পর পর কদিন। তুতু মিতুর খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল একদিন! মাঝরাতে একদিন ফ্রিজ খুলে সন্দেশ খাচ্ছিল! সবই করে ঘুমের ঘোরে। ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটছে, এঘর থেকে ওঘর যাচ্ছে, বকবকও করে যাচ্ছে অবিরাম। হঠাৎ হঠাৎ চিৎকারও করে ওঠে। খারাপ খারাপ গালাগালি দেয়। হাত পা'ও ছোঁড়ে মাঝে মাঝে। ড্রয়িংরুমে ঢুকে টিভিটা তো প্রায় ভেঙেই ফেলছিল। তুতু মিতু পর্যন্ত হতবাক।

রাগের চোটে বীথি সেদিন একটা থাপ্পড়ই কষিয়ে দিল। মার খেয়ে তবে থমকাল মেয়েটা। টলে টলে চলে গেল বিছানায়। যেতে যেতে বিড়বিড় করছে, গান.... নাচ.....যাত্রা.....।

সুজয় বলল,—যথেষ্ট হয়েছে। এবার মানে মানে ওই পাগলকে বিদেয় করো।

আশ্চর্য, সকাল হলে কিন্তু রাতের আচরণের কথা একটুও মনে করতে পারে না বেস্পতি। তখন তার চেহারা নিপাট ভালমানুষ।

বীথি বহু বার প্রশ্ন করে দেখেছে,—হ্যাঁ রে বেস্পতি, তুই কি তোর বাড়িতেও এরকম করতিস? ঘুমের মধ্যে হাঁটতিস?

বেস্পতি অবাক চোখে তাকায়,—জানি না তো মামী।

বীথিকে আজকাল আর কোনও কাজের কথা বলতে হয় না, বেস্পতি নিজেই ঝটপট সেরে ফেলে সব। কথাও বলে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে,—জানো মামী, তোমাদের রান্না যেমন স্বাদের হয়, আমাদের তেমন হয় না। হবে কী করে বলো, তোমাদের মতো তো আর তেলমশলা পড়ে না। কী সুন্দর বাস তোমাদের তরকারিতে।

একদিন বলল,—সালোয়ার কামিজ পরে তুতুদিকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল গো মামী। আমায় একটা তুতুদিদির পুরোন সালোয়ার কামিজ দেবে?

দেবে বলেছিল বীথি। তবু যে কেন ঘোর নিশীথে তুতুর নতুন কামিজটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ল বেস্পতি! শব্দ পেয়ে বেরিয়ে আসতে যেটুকুনি সময়, তার আগেই কামিজ চার টুকরো, মিতুর ড্রয়ার মেঝেয় আছড়ে ফেলে তার ড্রয়িংখাতা আর কমিকস্ ছিঁড়ছে মেয়েটা!

এরপর আর ওই জ্যান্ত আপদ পুষে রাখার কোনও মানে হয়? পরদিনই বীথি খবর পাঠাল গোপালের মাকে। যাদের জিনিস তারা এসে নিয়ে যাক।

গোপালের মা তো সব শুনে থ। বেস্পতিকে জিজ্ঞেস করল,—কী রে, এরা যা বলছে সত্যি?

বেস্পতি নতমুখে দাঁড়িয়ে।

—কী রে, জবাব দিস না কেন?

ধমক খেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল বেস্পতি,—জানি না।

—তাহলে এরা বলছে কেন?

বেস্পতি নীরব।

গোপালের মার চোখ মুখ কঠিন হল আরও—মিথ্যে বদনামকে আমরা বড় ভয় পাই গো বউদি। ও বলছে কিছু জানে না, এদিকে তোমরা বলছ.....

বীথি রেগে গেল ঝপ করে,—আমরা কি মিথ্যে বলছি? তুমি বাবু কালকেই ওকে নিয়ে যাও।

—ঠিক আছে। টাকা পয়সা সব মিটিয়ে দাও। আজ বিকেলেই এসে নিয়ে যাব।

গোপালের মা চলে যাওয়ার পর বেস্পতি গুম হয়ে গেল। খেল না, দেল না, শুকনো মুখে ঠায় বসে রইল রান্নাঘরে। বীথিও সাধাসাধি করল না বিশেষ। সব বাড়াবাড়িরই তো একটা সীমা থাকা উচিত।

www.boiRboi.blogspot.com

মোটামুটি সব ঠিকঠাকই ছিল, তুতু স্কুল থেকে ফিরে গণ্ডগোলটা পাকিয়ে দিল,—কেন তোমরা বেস্পতিকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মা? বাবাই তো বলে বেস্পতি অসুস্থ, তাহলে কেন ওর ট্রিটমেন্ট করালে না?

বীথি চোখ পাকিয়ে বলল,—যা বোঝ না তাই নিয়ে কথা বোলো না তো।

মিতু কেঁদেই ফেলল,—তোমরা ভাল না, একটুও ভাল না।

বীথি উত্তর দিল না। দেওয়ার কোনও মানেও হয় না। বীথি সুজয়ের কি আর খেয়ে দেয়ে কোনও কাজ নেই যে ওই অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে ছুটবে? তার চেয়ে বরং বড় কোনও বিপদ আসার আগে বেস্পতিকে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। সেটাই উচিত। বেস্পতি তার নিজস্ব জায়গাতেই ফিরে যাক। এতেই তো সকলের মঙ্গল। তুতুর মিতুর বীথির সুজয়ের। নয় কি?

তুতুল

বাস স্টপে মৈনাকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল তুতুল। মার অপেক্ষায়। আজ রবিবার, আজ তার মার কাছে যাওয়ার দিন।

মৈনাকের মুখ যথারীতি গম্ভীর। প্রতি রবিবার সকালে এমনটাই থাকে। কোর্টের হুকুমে সপ্তাহে এক দিন মেয়েকে পাঠাতে হয় বর্ণালির কাছে, এতেই বুঝি মেজাজটা কষটে হয়ে থাকে মৈনাকের। দেখতে দেখতে পনেরো মাস কেটে গেল, তবু এখনও যেন বন্দোবস্তটায় ঠিক ধাতস্থ হল না।

তুতুল চোরা চোখে মাঝে মাঝে দেখছিল বাবাকে। আজ যেন একটু বেশি ছটফট করছে বাবা। ঘড়ি দেখছে বারবার। কোথাও যাওয়ার তাড়া আছে নাকি? আড্ডায় যাবে? নাকি সুচেতা আন্টির বাড়ি? জিজ্ঞেস করলে সত্যি জবাব অবশ্য মিলবে না। তুতুল জানে। মা দেরি করছে বলে বাবা কি রেগে যাচ্ছে মনে মনে? কেন যে মা সময়মতো আসে না।

আচমকাই মৈনাকের গলা বেজে উঠেছে, আজ কিন্তু ওই বাড়িতে উল্টোপাল্টা কিছু খাবে না তুতুল। রাত্তিরে যেন না শুনি পেট ব্যথা করছে।

তুতুলের শরীর সামান্য শক্ত হয়ে গেল। বেচারা কী ঝঞ্ঝাটেই না পড়েছিল আগের দিন! মা নিজের হাতে তারই জন্য চাউমিন বানাল, না খেয়ে সে চলে আসে কী করে! আবার যতই পেট ভরা থাক, বাড়ি ফিরে তো খাব না বলার উপায় নেই। ঠাম্মার গোঁসা হবে, বাবা গুম মেরে যাবে....। অগত্যা

ওই পেটব্যথার বাহানা। তুতুলকে যে এখন কত ভাবে কত দিক সামলেসুমলে চলতে হয়!

রোজ রোজ একই কৌশল যে চলবে না, তুতুল খুব বোঝে। তাই মৃদু স্বরে বলল, আচ্ছা।

—আর শোনো, আরও একটা কথা। মৈনাক পকেট থেকে সিগারেটের পাকেট বার করল। ঠোঁটে ফিল্টারের দিকটা চেপে বলল, রোজ রোজ দামি গিফ্‌টও নেবে না।

তুতুল তাড়াতাড়ি বলল, নিই না তো।

—এই সেদিনও তুমি একটা হ্যারি পটার এনেছ তুতুল।

—বা রে, মা আমার জন্য কিনে রেখেছিল যে। ভিসিডিও দিতে চেয়েছিল, আমি তো বারণ করলাম।

—ভাল করেছে। বইও আর নেওয়ার দরকার নেই। দিতে গেলে বলবে, আমার আছে। বাবা কিনে দিয়েছে। মনে থাকবে?

—হুঁ।

—লক্ষ্মী মেয়ে। দশ ছুইছুই তুতুলের গালে আলগা টোকা দিল মৈনাক। গলগল করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়ল মুখ থেকে। তারপর ভারি নরম সুরে বলল, আমি তো তোকে সব কিছুই কিনে দিই রে। যা তুই চাস। দিই না?

—আমি কি তাই বলেছি কখনও?

—তা হলে কেন অন্য কারও কাছ থেকে কিছু নিবি? আমরা মিষ্টি মেয়েটাকে যদি কেউ হ্যাংলা ভাবে, আমার কি ভাল লাগে? তুইই বল?

কেউটা কে? কুশল আংকল? ধুস্, সেই লোকটা কী ভাবল না-ভাবল তাতে তুতুলের বয়েই গেল। অবশ্য মাকে এখন অন্য কেউ বলতে পারে বাবা। বলতেই পারে। মা যখন বাবাকে ছেড়ে কুশল আংকলকে বিয়ে করেছে....। তবে যাই হোক না কেন, তুতুলের কাছে তো তার মা এখনও বাইরের লোক হয়ে যায়নি। মা আদর করলে এখনও একই রকম ভাল

www.boiRboi.blogspot.com

লাগে তুতুলের। মার গায়ের গন্ধটাও হুবহু আগের মতোই। তা ছাড়া যে মা তুতুলকে দেখার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকে, তুতুলের সম্পর্কে সে উল্টোপাল্টা ভাবতে যাবেই বা কেন?

বাবাকে অবশ্য কথাগুলো বলল না তুতুল। বলে কী লাভ, হয় বাবা মন খারাপ করবে, নয় দুম করে রেগে যাবে। বড়রা এক এক সময়ে যা অবুঝপনা করে!

মৈনাক চশমা খুলে কাচ মুছছে। ফের চশমা পরে নিয়ে বলল, যাক গে, কাজের কথা শোনো। আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবে। সন্ধের মধ্যে।

—কেন বাবা?

—সন্ধেবেলা তোমার সুচেতা আন্টির মাও আসতে পারে। এসে হয়তো তোমায় খুঁজবে।

তুতুল পলকে টানটান। সুচেতা আন্টির মাকে তার একটুও ভাল লাগে না। কেমন করে যেন তাকায় তুতুলের দিকে। বিচ্ছিরি ন্যাকা ন্যাকা সুরে কথা বলে। এমন ভাব, যেন সেই তুতুলের আসল দিদা! গা জ্বলে যায়। আজ বাদে কাল সুচেতা আন্টি তো বাবার ঘাড়ে চাপবেই, তখন তুতুলকে দেখুক না যত খুশি, এখন ঢঙ করার দরকারটা কী!

তুতুলের মুখ দিয়ে ঝটিতি বেরিয়ে গেল, কিন্তু আজ যে আমার একটু দেরি হবে বাবা।

—কেন?

—মা বলছিল, আজ আমায় নিকো পার্ক নিয়ে যাবে।

—আজ? মৈনাকের ভুরু জড়ো, কই, একবারও বলিসনি তো!

—না, মানে...। তুতুল ঢোঁক গিলল। ফের মিথ্যে করে বলল, সরি বাবা, একদম ভুলে গিয়েছিলাম গো। মিসটেক।

—আশ্চর্য, এত ঘন ঘন নিকো পার্ক যাওয়ার কী আছে? গত মাসেই তো আমার সঙ্গে গিয়েছিলি। মৈনাক রীতিমতো অপ্রসন্ন। জোরে জোরে

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না না, আজ নিকো পার্ক ক্যানসেল। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

—কিন্তু বাবা, মা যে....

—নো কিন্তু। তোমার মা চাইলেই তো হবে না। আমার সুবিধে অসুবিধেগুলোও তাকে দেখতে হবে। মৈনাক উত্তেজিত হতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। কোমল স্বরে বলল, তোর মাকে বলিস প্রোগ্রামটা নেক্সট উইকে করতে। ঠিক আছে?

তুতুলের মিথ্যে অজুহাত টিকল না। সন্ধেবেলা সেই তাকে ওই বকবকে বুড়িটার মুখ দেখতেই হবে। উফ্, বড়রা যে কতভাবে ছোটদের জীবন অসহ্য করে দেয়!

সেভাবে বেজার হওয়ার অবকাশটাও অবশ্য পেল না তুতুল। তার আগেই ঘ্যাঁচ করে সামনে এক ট্যাক্সি। বর্ণালি এসে গেছে।

চিপস্ খেতে খেতে টিভির পরদায় 'ক্রিশ' দেখছিল তুতুল। তন্ময় হয়ে। গত দিনই মাকে বলে গিয়েছিল, কুশল আংকলকে দিয়ে ফিল্মটার ডিভিডি আনিয়ে রেখেছে মা। টালিগঞ্জে, বর্ণালির এই ফ্ল্যাটে তুতুলের ইচ্ছে মানেই আদেশ। তার মুখের কথাটুকু শুধু খসার অপেক্ষা, যা চাইবে তা সে পাবেই। সাত-আট মাস এ-বাড়িতে এসে এসে এই সারসত্যটুকু দিব্যি বুঝে গেছে তুতুল।

রান্নাঘর থেকে এক থালা ফিশফিংগার ভেজে এনে সেন্টারটেবিলে রেখেছে বর্ণালি। ছোট্ট ড্রয়িং স্পেসটার আলো জ্বেলে দিয়ে বলল, এত অন্ধকারে টিভি দেখে না তুতুল। চোখ খারাপ হয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালঘড়িতে নজর গেছে তুতুলের। অস্ফুটে বলে উঠল, ওমা, সাড়ে ছ'টা!

—তো?

একটা ফিশফিংগার হাতে তুলে নিয়ে তুতুল গা মুচড়ে বলল, এবার যে আমায় যেতে হবে মা।

—এখনই কী রে? আটটা বাজুক।

—না মা, আজ এত দেরি করা যাবে না।

বর্ণালির চোখ সরু হল, কেন? তোর বাবা বলে দিয়েছে বুঝি?

—না না। তুতুল তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। মুখটা কাচুমাচু করে বলল, অনেক হোমওয়ার্ক বাকি আছে মা। গিয়ে করতে হবে।

—তা এখানে বইখাতা নিয়ে আসিসনি কেন? তোর কুশল আংকল তো সারা দিন বসেই আছে, তোকে দেখিয়ে দিত।

এই সব আদিখ্যেতা মার্কা কথা তুতুলের একদম পছন্দ নয়। এখানে খাতাবই আনলে মা'ই তো তাকে পড়া দেখিয়ে দিতে পারে, কুশল আংকলের প্রয়োজনটা কী! তবু মা এই ধরনের কথা বলবেই। প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করতে চাইবে, তুতুলের কথা ভেবে ভেবে যেন মরে যাচ্ছে কুশল আংকল! বুঝলি তুতুল, তুই ভালবাসিস বলে তোর আংকল আজ বাজার থেকে এত্ত ভেটকি মাছের ফিলে এনেছে!... কাণ্ড দ্যাখ্ তোর আংকলের, তোর জন্য কোল্ড ড্রিংকসে ঠেসে ফেলেছে ফ্রিজ!.... জানিস তো, তোর আংকল তোকে জন্মদিনে কী প্রেজেন্ট করবে! গেস্ কর, গেস কর.... পারলি না তো! ডিজিটাল ক্যামেরা!

শুনতে শুনতে এক এক সময়ে কেমন যেন রাগ হয় তুতুলের। আবার হাসিও পায়। কী ভাবে তাকে তার মা? সে কি আগের মতো সেই বোকাটি আছে? না কচি খুকি? যে বাবা-মার লড়াই ঝগড়া দেখে সিঁটিয়ে থাকত, আর ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদত? কটা ধানে কটা চাল হয়, তুতুল এখন ভালমতোই বোঝে। কোনটা ঘুষ, কোনটা উপহার, কোনটা আদর, কোনটাই বা আহ্লাদিপনা, চিনতে তার আর মোটেই ভুল হয় না।

বর্ণালি এসে বসেছে তুতুলের পাশে। না তাকিয়েও তুতুল টের পেল মা তাকে দেখছে এক দৃষ্টে। একটু যেন অস্বস্তিই হচ্ছিল তুতুলের। রিমোট টিপে টুকুস অফ করে দিল টিভিটা।

অমনি বর্ণালি হাঁ হাঁ করে উঠেছে, সে কী করে, সিনেমাটা পুরো দেখলি না?

www.boiRboi.blogspot.com

আর একখানা ফিশফিংগারে কামড় দিল তুতুল। ভারিক্কি মুখে বলল, আজ আর সময় হবে না গো।

—তোর কুশল আংকল কত খুঁজে খুঁজে আনল... কোনও ভিডিও লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছিল না...!

—সাত দিন রেখে দাও। পরের সান্‌ডে এসে দেখব।

—কিন্তু আমরা যে ভাবছিলাম সামনের রোববার তোকে নিয়ে নিকো পার্ক যাব। তোর কুশল আংকল বলছিল, অনেক দিন তোকে রাইডে চড়ানো হয়নি...!

কী কাণ্ড, বাবাকে যে গুলটা মারল তুতুল, সেটাই ঘুরে-ফিরে সত্যি হয়ে যাবে নাকি? কিন্তু কুশল আংকলের নামটাই যে একটা অনিচ্ছে তৈরি করছে মনে।

মুখ বেঁকাল তুতুল, আমার আর রাইডস্-ফাইডস্ ভাল লাগে না মা। আমি সিনেমাই দেখব।

—তোর কী হয়েছে বল তো? বর্ণালির চোখ তীক্ষ্ণ।

—কী আবার হবে! কিচ্ছু না।

—বললেই হল? ভুলে যাস না তুতুল, আমি তোর মা। তোর মুখ দেখে আমি সব বুঝতে পারি।

তুতুল মনে মনে বলল, ছাই পারো।

মুখে বলল, উফ্, বলছি তো কিছু হয়নি।

—আমার কাছে লুকোস না তুতুল। ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই দেখছি তোর মুড অফ। দুপুরে ভাল করে খেলিও না। তুই ভালবাসিস বলে টোম্যাটো দিয়ে টকমিষ্টি চিকেন রাঁধলাম, শুধু খুঁটে গেলি। ফ্রায়েড রাইসও তিন চামচের বেশি মুখে তুললি না। বর্ণালি মেয়ের পিঠে হাত রাখল, বুঝেছি কেন তোর মন খারাপ। তোর বাবা আবার বিয়ে করছে, তাই তো?

তুতুলের বুকটা চিনচিন করে উঠল। গলার কাছে ঠেলে আসা ডেলাটাকে গিলে নিয়ে উদাস গলায় তুতুল বলল, কী জানি!

—করছে। করছে। আমার কানে সব আসে। দ্যাখ হয়তো এই শ্রাবণেই...

বাহ্, মা তো পাক্কা নিউজ পেয়েছে! অবশ্য পাবে নাই বা কেন, দু'জনের তো একই অফিস। ব্রাঞ্চটাও আগে একই ছিল, ডিভোর্স নিয়ে এখন আলাদা আলাদা। কিন্তু কমনফ্রেন্ড তো আছে ঝুরি ঝুরি। শীলামাসি, কমল আংকল, সর্বোদয় কাকু...। বড়দের যা ঘোঁট করা স্বভাব, তারাই বুঝি পৌঁছে দিয়েছে খবর।

তুতুল মনে মনে বিড়বিড় করল, জানোই যখন, জিজ্ঞেস করছ কেন? আমাকে খোঁচানোর দরকারটা কী?

মেয়েকে গোমড়া দেখে তাকে আর একটু কাছে টেনেছে বর্ণালি। আরও নরম গলায় বলল, সুচেতা শুনলাম খুব যাচ্ছে ও-বাড়িতে? সত্যি? তোর ঠাম্মার সঙ্গে পটেছে?

এবারও হ্যাঁ-না কিছুই বলল না তুতুল। বলতে ইচ্ছেই হল না। নীচের ঠোঁটটা ঝুলে গেল শুধু। যা খুশি ভেবে নিক।

—তোর ঠাম্মার সঙ্গে মানিয়ে চলা? বাপ্স! মহিলা একটি চিজ বটে। সুচেতাই আসুক, আর ফিচেতা, কারও সঙ্গে মিলমিশ খাবে না, দেখে নিস। ওঁর বাক্যবান কেউ হজম করতে পারবে না।

তুতুলের অধর আর একটু ঝুলে গেল।

—তা হ্যাঁ রে, সুচেতা তোর সঙ্গে কথা-টথা বলে? ভাব হয়েছে?

কথা না বলে উপায় আছে তুতুলের, যা গায়ে পড়া মহিলা!

চেনা ছকের উত্তরটাই অবশ্য হাওয়ায় ভাসাল তুতুল, আমি পাত্তা-টাত্তা দিই না।

প্রত্যাশামতোই বর্ণালির চোখ তৃপ্তিতে জ্বলজ্বল। তবু বুঝি মেয়েকে বাজানোর জন্য বলল, তা বললে তো চলবে না তুতুল। আজ বাদে কাল সে তোমাদের বাড়িতে আসবে, তাকে হয়তো তোমায় মা বলে ডাকতে হবে...

—আমি আর কাউকে মা বলবই না। যাকে-তাকে মা বলে ডাকবই বা কেন? আন্টি বলব।

www.boiRboi.blogspot.com

বর্ণালি মহা পুলকিত এবার। মেয়ের গালে গাল গাল ঘষে বলল, তোর যদি তখন ওখানে ভাল না লাগে, এখানে এসেও থেকে যেতে পারিস। দেখেছিস তো, কুশল আংকল তোকে কত ভালবাসে। তোর এখানে একটুও অসুবিধে হবে না।

আজকাল প্রায়শই মেয়ের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ে বর্ণালি। জানে এরকমটা হওয়া সম্ভব নয়, তুতুলের বাবা তুতুলকে ছাড়বে না, কথাটা ও-বাড়িতে উঠলেই একটা তুলকালাম হবে, তবুও একবার করে বলা চাই। তাছাড়া তুতুলই বা আসবে কেন? সুচেতা আন্টির বদলে কুশল আংকলের সঙ্গে থাকলে তুতুলের কি দুটো ডানা গজাবে? উল্টে যাওবা একটা ঠাম্মা আছে, তাও ছাঁটাই হয়ে যাবে জীবন থেকে। মা যদি দাদু-দিম্মার সঙ্গে থাকত, তাও নয় একটা কথা ছিল। কোন্ দুঃখে আরও একা হবে তুতুল?

প্রসঙ্গটা আর গড়াতে না দিয়ে তুতুল হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যস্তসমস্তভাবে বলল, ইশ, সাতটা প্রায় বাজতে যায়! চলো মা, চলো চলো। বাড়ি গিয়ে আমার কতগুলো সাম্‌স করতে হবে জানো! বাবার আবার ইংলিশটাও ধরবে আজ।

বর্ণালির মুখ নিমেষে পাংশু। চুপচাপ উঠে চলে গেল বেডরুমে। শাড়ি বদলাচ্ছে। কুশলকেও বুঝি কিছু বলল, কমপিউটার ছেড়ে কুশল এসেছে তুতুলের কাছে। হালকা গলায় বাতচিত চালাল একটুক্ষণ। বারবার জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, পরের দিন আর কোন্ কোন্ ফিল্মের ডিভিডি চায় তুতুল।

রাস্তায় বেরিয়ে, শুকনো মুখ মার পাশে হাঁটতে হাঁটতে, তুতুলের বেশ খারাপ লাগছিল। মার দুঃখে নয়, বাড়ি ফেরার আতঙ্কে। আরও কিছুক্ষণ থেকে গেলে হত। বাড়ি ঢোকা মানেই তো এখন সুচেতা আন্টি আর তার বকবকে ষষ্ঠীমার মুখোমুখি হওয়া। বিশ্রী বিশ্রী।

অবশ্য টালিগঞ্জে কুশল আংকলের ফ্ল্যাটই বা তার কী এমন স্বর্গপুরী!

রাতে খেয়ে উঠে রুটিন দেখে দেখে বইখাতা স্কুল ব্যাগে ঢোকাচ্ছিল তুতুল। সকাল পৌনে আটটায় স্কুল বাস আসে, তার আগে স্নান সারো,

ইউনিফর্ম পরো, ব্রেকফাস্ট খাও... এক রাশ তাড়ার মাঝে স্কুল ব্যাগ গোছানোর সময় থাকে কই! মা তো তার থেকেও নেই, শেষ মুহূর্তে কেইবা স্কেল-পেনসিল গুঁজে দেবে ব্যাগে!

মৈনাক ঘরে ঢুকেছে। দু'-চার সেকেন্ড স্থির দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করল মেয়ের কার্যকলাপ। জিজ্ঞেস করল, কী রে, কালকের হোমওয়ার্ক সব ঠিকঠাক হয়েছে তো?

তুতুল চোখ তুলল, মান্‌ডের হোমওয়ার্ক তো আমি স্যাটারডে নাইটেই করে রাখি বাবা।

—ভেরি গুড হ্যাবিট। কোনও কাজ পরে করব বলে ফেলে রাখতে নেই। অকারণে দেরি করলে পস্তাতে হয়।

বাবার উপদেশটায় কেমন যেন একটা গন্ধ পেল তুতুল। ঠিক চিনতে পারল না গন্ধটাকে। মার কাছে যাবে বলে সে তো আগের দিনই হোমওয়ার্কের পাট চুকিয়ে রাখে। বাবা জানে। তবু অমন ধারার কথা বলে কেন আজ?

মেয়ের স্টাডি-টেবিলের সামনের চেয়ারটা টানল মৈনাক। বসেছে। চোখ নাচিয়ে বলল, তোর নতুন দিদাকে আজ তো তুই একেবারে ফ্ল্যাট করে দিয়েছিস রে তুতুল।

বাহ্, বাহ্, সুচেতা আন্টির মাকে তুতুল কী বলে ডাকবে তাও ঠিক করে ফেলেছে বাবা?

যা-খুশি করুক গে। কেন্তু তুতুল আজ কী এমন নতুন গুণপনা দেখাল, যে ওই মহিলা হঠাৎ উড-বি জামাইয়ের মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ?

প্রশ্নের অপেক্ষায় নেই মৈনাক। ফের বলল, উনি আজ তোমাকে একটা জব্বর কম্‌প্লিমেন্ট দিয়েছেন। তোর মতো ওয়েল বিহেভড বাচ্চা নাকি আর একটাও নেই। আর অ্যাম প্রাউড অফ ইউ, তুতুল।

ভাল লাগা দূরে থাক, একটু যেন রাগই হল তুতুলের। কবে সে কোথায় কার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছে? কবে? বাড়িতে অতিথি এলে সে হাসিমুখে কথা বলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তা নতুন দিদাটি নয় তুতুলকে তেল মারার জন্য সার্টিফিকেট দিতেই পারে, বাবা তাতে এত গদগদ কেন?

www.boiRboi.blogspot.com

মৈনাক সোজা হয়ে বসেছে। চকচকে মুখে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে তুতুল, তোকে তখন সুচেতা এ-ঘরে ডেকে আনল কেন রে? কোনও গিফ্‌ট-টিফ্‌ট দিল বুঝি?

তুতুল অস্ফুট বলল, হুঁ।

—কী দিল?

নিঃশব্দে জিওমেট্রি ব্যাগে ঢোকাল তুতুল। চেন আটকাল ব্যাগের। নিরুত্তাপ গলায় বলল, বই। হ্যারি পটার।

—বলিস কী রে? সুচেতাও হ্যারি পটার? তোর মার বইটার সঙ্গে এক হয়ে যায়নি তো?

তুতুল ঠান্ডা চোখে দেখল বাবাকে। সে হলফ করে বলতে পারে, বাবা অবশ্যই সুচেতা আন্টিকে বলে দিয়েছে কোন্ হ্যারি পটারটা মা দিয়েছে তাকে। ছোটদের বুদ্ধু ভাবার মতো বোকামি কেন যে করে বড়রা!

শান্ত স্বরে তুতুল বলল, নাহ্। এটা অন্য বই। পুরনোটা। চেম্বার অফ সিক্রেট্‌স।

—যাই হোক, তোর স্টার তাহলে এখন ভালই যাচ্ছে, কী বল? বেশ গিফ্‌ট-টিফ্‌ট পাচ্ছিস। মৈনাক শব্দ করে হাসল, সামনে আবার তোর জন্মদিন...উপহারে উপহারে ঘর তো বোঝাই হয়ে যাবে রে। নতুন একটা আলমারি না বানাতে হয়!

—হুঁ।

—এবার ভাবছি তোর বার্থডে পার্টিটা আরও বড় করে করব। আমাদের ক্লাবের রুফটপ্‌টা ভাড়া করে দেদার ফান। এবার একজন ম্যাজিশিয়ানকেও নিয়ে আসব। জমবে না খুব?

—হুঁ।

—আমার মেয়ের এজ ডবল ফিগারে পৌঁছচ্ছে, এ কি যে-সে ইভেন্ট? তুই তোর বন্ধুবান্ধবদের একটা এস্টিমেট আমায় কিন্তু আগেই দিয়ে দিবি। সুচেতাকে লিস্টটা ধরিয়ে দেব, পছন্দ করে রিটার্ন গিফ্‌ট কিনে আনবে।

পলকের জন্য তুতুলের সামনে তার মার মুখ। মেয়ের জন্মদিনে খুশিতে যেন ঝলমল করত মা। ছোট্ট করেই হত অনুষ্ঠান। এই হয়তো দাদু-দিদারা এল, একজন-দু'জন মাসি-পিসি, আর তুতুলের কয়েকজন বন্ধু, ব্যাস। নিজের হাতে প্রতিটি রিটার্ন গিফ্‌ট রাংতায় মুড়ত তুতুলের মা, ছোট ছোট কার্ড মাছ ফুল পাখির শেপে কেটে কেটে তাতে প্রত্যেকের নাম লিখে দিত। বাবা আর মা দু'জনে মিলে রঙিন কাগজের শিকল দিয়ে সাজাত ঘর। তুতুল কেক কাটার পর একসঙ্গে হাঁ করত দু'জনে। ওইসব ছবি কীভাবে যে বদলে গেল! গত বছর ঘটাপটা করেই মেয়ের জন্মদিন পালন করল বাবা, অথচ তুতুলের মা সেখানে নেই। রেষারেষি করে তুতুলকে পাঠালই না দাদুর বাড়ি, দেখাই করতে দিল না মার সঙ্গে। সেই মার জায়গায় এবার সুচেতা আন্টি হবে তুতুলের জন্মদিনের হোস্ট? ভাল লাগছে না ভাবতে, তুতুলের একটুও ভাল লাগছে না।

তুতুলের মুখভাব দেখে এতক্ষণে মৈনাক বুঝি আঁচ করেছে কিছু। উচ্ছ্বাসটাকে একদম খাদে নামিয়ে বলল, চাইলে এবার জন্মদিনে তুই তোর মাকেও ডাকতে পারিস।

তুতুল সাড়া করল না। স্কুল ব্যাগ পড়ার টেবিলে রেখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কাছে টেনে নিল মৈনাক। মাথায় হাত রেখে বলল, কী হয়েছে রে তোর? মুখটা অমন পেঁচার মতো করে আছিস কেন?

—কই না তো! চোয়াল অল্প ফাঁক করে হাসির মুদ্রা ফোটাল তুতুল, কিছু হয়নি তো!

—বললেই হল? দেখতে পাচ্ছি কিছু হয়েছে।

—না গো। বিশ্বাস করো।

—মা আজ কিছু বলেছে বুঝি?

—নাহ্। কী বলবে?

—এই যে তুই আজ তাড়াতাড়ি চলে এলি... মাকে বলেছিস কেন ফিরতে হচ্ছে?

উত্তর দিতে সময় নিল না তুতুল। ঝটিতি বলল, হ্যাঁ।

—কী বললি?

—যা সত্যি তাই। ততুলের স্বর একটুও কাঁপল না, বললাম সুচেতা আন্টিরা আসবে।

—শুনে মা কী বলল?

—কিছুই না। ফিশফিংগার ভাজছিল তো, আমাকে আর কুশল আংকলকে বলল, ঠান্ডা না করে গরম গরম খেয়ে নিতে।

—তোকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হল বলে একটুও রাগ করল না?

—উহুঁ। শুধু বলল, তোকে যখন যেতেই হবে...বাড়িতে তোকে ড্রপ করে দিয়ে আমি আর তোর কুশল আংকল বরং তাহলে 'কভি আলবিদা না কহেনা' দেখে আসি।

—সুচেতার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করল না?

—না তো!

—আ।

মৈনাক হঠাৎই চুপসে গেছে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে বেরিয়ে এল সিগারেটের প্যাকেট। দেশলাইটাও। ধরাল না সিগারেট, অন্যমনস্ক হাত নাড়াচাড়া করছে প্যাকেটখানা। দুম করে উঠে পড়ল। তুতুলকে গুড নাইট না বলেই বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর ছেড়ে।

তুতুল ফিক করে হেসে ফেলল। মার মিয়োনো মুখ দেখেও এই হাসিটা বুড়বুড়ি কাটে আজকাল। তবে বেশিক্ষণ টেকে না হাসিটা। কখন যেন উবে গিয়ে জ্বালা করতে শুরু করে দু'চোখ। মনে হয়, এবার বুঝি সে কেঁদেই ফেলবে।

কিন্তু কান্না আর আসে কই তুতুলের? চোখের জল যে শুকিয়ে গেছে। একটু একটু করে।

www.boiRboi.blogspot.com

অবগাহন

অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশীতে গঙ্গাস্নান যাওয়া হেমলতা আর স্মৃতিকণার বহু দিনের পুরোন অভ্যাস। বিশেষ কোন তিথি বা যোগ থাকলে তো কথাই নেই। কাকভোরে বেরিয়ে পড়েন দুজনে। ছোট পিতলের ঘাট, একখানা কাপড় আর গামছা হাতে যখন রওনা দেন, আশপাশের বাড়িঘর আধবোজা চোখে সবে শরীরের আড় ভাঙছে তখন। রাতের গ্লানি গায়ে মেখে সরু গলিটা এলিয়ে আছে বাজারের মেয়েদের মত। রাতজাগা রাস্তার বাতি মাতালচোখে পিটপিট তাকাচ্ছে। দুই বুড়ি বড় সন্তর্পণে দেখেশুনে পথ চলেন। গলি পোরোলে বড় রাস্তা। তারপর বাস রাস্তা। তারপর ফাঁকা বাসের কোলে চড়ে হুহু করে কালীঘাট।

হেমলতা হাঁটু বরাবর কাপড় তুলে এক দলা কফ পার হলেন, —মাগোঃ। এত বৃষ্টিতেও রাস্তাটা একটু পরিষ্কার হল না গো!

—হবে কি করে? পোড়ারমুখোরা ধোয়ামোছা থাকতে দেয় কিছু? দেখুন না, এই সাতসকালেও কেমন এক নাদা হেগে রেখেছে।

গোড়ালি তুলে জিভ মেরে হাঁটছেন স্মৃতিকণা। দুই বুড়িকে দেখাচ্ছে ঠিক থপথপে ব্যাঙের মত। অনেক কসরত করে গলিটুকু পার হতে হবে। কাল রাতে জোর এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন সেখানে জমে গেছে ঘোলাটে জল। আঁশটে গন্ধ ম ম করছে চতুর্দিকে। ছড়িয়ে থাকা নোংরা ন্যাকড়া, এঁটোকাটা, মানুষ কুকুরের পায়খানা সব মিলে মিশে একাকার।

www.boiRboi.blogspot.com

বহু কাল এ গলির কোন সংস্কার হয় নি। জায়গায় জায়গায় ডুমো গর্ত। পীচ ঢালাই ঢেউ খেলে গেছে।

খানাখন্দ ভরা রাস্তাটাকে টপকে এসে নাক থেকে কাপড় নামালেন দুই বৃদ্ধা। ফুটপাতের বাসিন্দারা রকদালানে উঠে যাওয়াতে এ রাস্তাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা আজ। নেড়িকুত্তার দল যত্রতত্র গুটলি মেরে শুয়ে। পানসে আকাশ থেকে ভারী হাওয়া মাঝে মাঝে গতর নাড়াচ্ছে অলসভাবে। নিঝুম বাড়িগুলো থেকে ভেসে আছে ফ্যান চলার চাপা শব্দ। খোলা জানলায় লুটোপুটি খাচ্ছে পর্দারা।

দুই বুড়ি বাসস্টপে পৌঁছে দম নিলেন একটু। বাসস্ট্যান্ডের শেডের নীচে দুতিনটে লোক মাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। উল্টোদিকের ফুটপাতে বসে ঘনঘন গা চুলকে চলেছে এ পাড়ার মৌরি পাগলা। নাড়িভুঁড়ি চটকানো একটা বেড়াল থেঁতলে পড়ে আছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। সারা রাত জলে ফুলে শরীরটা তার এতখানি, রক্ত মাংস চামড়া লোম সব দলামলা। হেমলতা আর স্মৃতিকণা একপাশে জড়োসড়ে হয়ে দাঁড়ালেন।

—হাড়হাভাতেগুলো একটু দাঁড়ানোর জায়গাও রাখেনি গো।

—একটা বৃষ্টি হলেই শহরটা যেন নরক হয়ে যায়। এক সময় রোজ সকালে গঙ্গাজলে রাস্তা ধোওয়া হত। কোথায় যে গেল সে সব দিন।

—ঝাঁটা এখনও পড়ে। তবে ওপর ওপর। হেমলতা ঠোঁট বেঁকিয়ে আরেক বার তাকালেন চারপাশে। তখনই নজর গেছে ওদিকের ফুটপাতে। উল্টোমুখো একটি বাস থেকে এই মাত্র নামল মেয়েটা।

হেমলতার মুখে ভাঙচুর হল,—মণ্ডলদের মেয়েটা না।

স্মৃতিকণা ঘাড় ঘুরিয়ে জরিপ করলেন মেয়েটাকে,—এত সকালে খদ্দের ধরতে বেরিয়েছিল, অ্যাঁ!

—সকাল নয় দিদি, রাত বলুন। হেমলতার মুখে ভাঙচুর হল,—রাতের অভিসার সেরে মহারানী এখন ঘরে ফিরছেন।

—ছ্যা ছ্যা, দিনটাই আজ খারাপ যাবে গো। স্মৃতিকণা নতুন করে নাকে কাপড় চাপা দিলেন। —ভোর না হতেই বেবুশ্যেটার মুখ দেখতে হল।

—মেয়েটার চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখেছেন? কদিন আগেও কত সুন্দর ছিল। অত্যাচার করে করে এখন একেবারে পোড়া কাঠ।

মেয়েটা দুজনের পাশ কাটিয়ে উদাস ভাবে মোড় ঘুরে গেল। বাসি চুল তার এলোমেলো, ফোলা ফোলা চোখের নীচে গাঢ় কালি, রঙ জ্বলা সিল্কের ছাপা শাড়িটা লেপটে আছে শরীরে।

স্মৃতিকণা কটমট করে তাকালেন,—দু কানকাটা বেহায়া কোথাকার।

—ঝর্ণার বর বলছিল আজকাল নাকি খদ্দের ধরার জন্য ধর্মতলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—কান্তু বলে ওদের নাকি ঘর টরও ঠিক করা থাকে। খদ্দেরদের সেখানেই নিয়ে তোলে।

—কী ঘেন্না বলুন তো দিদি? ভদ্রলোকের পাড়ায় এমন একটা নোংরা মেয়ে! স্মৃতিকণা থুক করে থুতু-ফেললেন।

হেমলতার গলায় বমি ওঠার আওয়াজ। —পাড়ার ছেলেদের একদিন বলেছিলাম, হ্যাঁরে, তোরা কিছু বলতে পারিস্ না? তা তারা বলে, পাড়ার মধ্যে তো কিছু করে না ঠাকমা..... তেমন নোংরামি দেখলে আমরাও কি চুপ করে থাকতাম।

—ওদের আর দোষ কি। উঠতি বয়সের ছোকরা সব অমন একটা ডগডগে ছুঁড়ি নাকের ডগায় খেলে বেড়ালে.....

—পাড়াটা দিন দিন কেমন পাল্টে যাচ্ছে দেখেছেন? এই তো মুখুজ্যেদের সেজ বউ শুনি সেদিন দেওরের সঙ্গে.....

—মেয়ে বউ কে এখন বাদ আছে দিদি। অনাছিষ্টি অনাচারে ভরে গেল দেশটা। কারুর একটুকু পাপবোধ নেই।

একটা সরকারী বাস এসে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতে বলতেই দুই বুড়ি সেঁধিয়ে গেলেন বাসের খোলে।

www.boiRboi.blogspot.com

নির্জন রাস্তা ছিঁড়ে ছুটে চলেছে বাস। ফাঁকা বাসে গুছিয়ে বসে দুই বুড়ি পয়সা বার করছেন। বন্ধ শার্শির ঝনঝন শব্দের সঙ্গে ইঞ্জিনের আওয়াজ মিশে কানে তালা লাগার জোগাড়। দরজার দিকে থেকে ছুটে আসছে কনকনে জোলো বাতাস। হেমলতা সবে বসার চেষ্টা করলেন একটু,—আবার মনে হয় বৃষ্টি নামবে।

—নামুক। নামুক। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক। হেমলতা হাতে পয়সা চেপে আঁচলের গিট শক্ত করে বাঁধলেন,—ভগবার নেয়ও না আমাদের, আরও কত কি যে দেখতে হবে।

—যা বলেছেন। অসভ্য বেহায়াদের যুগ এটা। ওই মেয়েটাকেই দেখুন না। দাদাটা যা হক বিয়ে তো দিয়েছিল একটা। তুই ঘর করতে পারলি না, বছর না ঘুরতে ফিরে এলি। তোরই তো চরিত্তির.....

—নাগো দিদি, মেয়েটা আগে এরকম ছিল না। হেমলতার গলা আচমকা নরম যেন, অনেক দিন থেকে দেখছি। বাপমা মরা মেয়ে। দাদাটা তো পাঁড় মাতাল। বৌদিও শুনি দজ্জাল খুব। বিয়ে দিয়েছিল এক লম্পটের সঙ্গে। তা সে হারামজাদা নাকি মারধোর করত খুব। খেতে পরতেও দিত না। আরেকটা মাগীর সঙ্গে পিরীত করে এটাকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে।

—লেখাপড়াও তো শেখে নি কিছু।

—শিখলে কি আর এই গতি হয়। তবে লেখাপড়া শেখা মেয়েবউও তো দেখছি অনেক। তফাত নেই কোন।

—তা যা বলেছেন। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন স্মৃতিকণা। লেখাপড়া জানা মেয়েদের অবজ্ঞা আর অবহেলা সম্বল করেই তো তাঁর এখন বেঁচে থাকা। কোন্ যুবতী বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। এঘাট সেঘাট ঘুরে শেষ বেলায় এসে ঠেকেছেন ভাইপোদের সংসারে। আত্মীয় পরিজনদের হেঁসেল ঠেলে ঠেলেই এই জীবন কেটে গেল। ভাইপো দুটোর তাও কিছু টান আছে। শত হলেও পিসির হাতে মানুষ। দুই বউ মিলে মাথা চিবোচ্ছে তাদের। আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে তাঁদের এত তফাত। পিসিশাশুড়িই হক আর

শাশুড়ি হক, কাউকে অভক্তি অবহেলা করার জো ছিল না সেকালের মেয়েদের। তাঁর দুই ভাইপো বউ তাঁকে উল্টো ট্যাকে গোঁজে। পিসি নাকি বাতিকগ্রস্ত, পিসি নাকি হিংসুটে, দিনরাত এঁটোকাটা ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে খিটমিট করছে। তা তোরা সব চোখের সামনে অনাচার করবি, বলা যাবে না কিছু? ভাইপো দুটোও আজকাল তাল দেয় বউদের সঙ্গে। স্মৃতিকণার চোখের কোণে জলীয় বাষ্প জমে গেল। হেমতার স্পর্শে চমকে তাকালেন।

—কি ভাবছেন? আবার ভাইপো বউরা মুখ করেছে তো?

—ও তো দিদি নিত্যদিনের ব্যাপার। স্মৃতিকণার ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন,

—ভাবছি মরণ এত দেরী করছে কেন? আর কত দিন এই দুনিয়ায় বাস করতে হবে?

—এত ভেঙে পড়ছেন কেন দিদি? হেমলতা আলতো হাত রাখলেন স্মৃতিকণার উরুতে, —আমার অবস্থা ভাবুন তো। আপনার তো তবু কপাল ভাল; ভগবান দিয়ে কাড়েন নি। আর আমার? ছ ছটা ছেলের একটাও বাঁচল না। জন্মেই মরে গেল। রাগে দুঃখে কর্তা আবার বিয়ে করল। সতীনের ঘর করার কি জ্বালা, যে করেছে সেই শুধু জানে। রাগ করে চলে এলাম বাপের বাড়ি। এক ঝিগিরি থেকে আরেক ঝিগিরি। কর্তাও আর নিতে এল না। আমার মত দজ্জাল মুখরা মেয়ে নিয়ে নাকি ঘর করা যায় না। ভাল। ভাল। তা লক্ষীমন্ত বউও তো কপালে সইল না তোমার। সেই থেকে একবার এ ভাইএর বাঁদী হই, তো ও ভাইএর রাঁধুনি। বোনঝি এখন এক আদর করে কেন রেখেছে বোঝেন না? দুটিতে চাকরি করতে বেরোয়। সারাদিন তাদের বাচ্চা সামলাবে কে?

—হুঁ। স্মৃতিকণা মাথা দোলালেন, —আয়া রাখতে খরচা অনেক। দাঁড়ালেন। কালীঘাট আসছে। দুই বুড়ি ছলছল চোখে উঠে দাঁড়ালেন। রাস্তায় নেমে কোমর টান করার চেষ্টা করলেন দুজনেই। অমাবস্যাতে দুজনেরই বাতের ব্যথা বড় বাড়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

সেই যে সেদিন বৃষ্টি নামল, তারপর একটানা শুধু বর্ষা আর বর্ষা ছিল। জলে কদিন কলকাতা একেবারে ডুবুডুবু। স্মৃতিকণা হেমলতা দুজনের বাড়িতেই জল উঠেছিল। এঁদো গলিটা জুড়েই তো এক কোমর জল। শেষে দিন আটেক পর এক ফালি ঝকমকে রোদ উঠতে দুপুরে নাতনিকে ট্যাকে করে হেমলতা বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। স্মৃতিকণার সঙ্গে কটা দিন গল্প করতে না পেরে মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছেন,—ও দিদি, খবর শুনেছেন? মণ্ডলদের মেয়েটার নাকি খুব অসুখ?

—মরুক। ও মেয়ের মরাই উচিত। হেমলতা ঝামটে উঠলেন।

—এবার বুঝি মরবে। রথীনের বউ বলছিল কিসব খারাপ রোগ ধরেছে।

—সেকি! আমি যে কাল শুনলাম মেয়েটার পেট হয়েছে?

—পেট তো হয়েইছে। স্মৃতিকণার চোখ নাক মুখ সব একসঙ্গে কথা বলে উঠল,—সঙ্গে খারাপ রোগও। পাশের বাড়ির খুকু বলছিল, এই কদিনেই নাকি শয্যা নিয়েছে।

—কই, সেদিন দেখে এতটা বোঝা যায় নিতো!

—আমিও তো তাই বললাম খুকুকে। তা খুকু বলে ওই রোগ নিয়েই নাকি বেরোত। কদিন ধরে নাকি আর ওটার ক্ষমতা নেই। চাকা চাকা ঘা বেরিয়েছে। শুনছি দাদাই নাকি লাইনে নামিয়েছিল বোনকে।

—সেকি গো? হেমলতা শিউরে উঠেছেন।

—হ্যাঁ দিদি, আমাদের কালে বাপভাইরা ঝিগিরি করালেও ঠাঁই দিত ঘরে। দু মুঠো ভাত দিত। এখন নিজের পেটের ভাত নিজেকেই জোগাড় করতে হয়।

—নুড়ো জ্বেলে দি এমন যুগের মুখে। মেহলতা আর দাঁড়ালেন না। নাতনিকে সাপটে তুলে বাড়ি ফিরলেন। বুকটা হঠাৎই টিপটিপ করতে শুরু করেছে। নাতনিকে দুধ খাইয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেলেন। ঝর্ণাদের জন্য আজ কিছু ভাল জলখাবার করে রাখবেন। তবু যা হক তাকে তো দুবেলা

খেতে পরতে দিচ্ছে ঝর্ণা। মুখ ঝামটা একটু বেশি দেয়, তা দিক, কে আর কবে তার সঙ্গে মধু ঝরিয়ে কথা বলেছে।

রাতে সেদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন হেমলতা। পাঁকভর্তি একটা পুকুরে পড়ে হাঁসফাঁস করেছেন তিনি। চারদিকে তার নিকট অন্ধকার। পেটের ভেতর এক শিশু হাত পা ছুঁড়ছে। শিশুটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। হেমলতার সামনে এবার পতপত করে উড়ছে একটা সাদা থান। তারপর আবার অন্ধকারই অন্ধকার। আচমকা সেই অন্ধকার ফুঁড়ে গনগন করে উঠল একউনুন আঁচ। হেমলতা হাতা কড়া খুন্তি খুঁজছেন। কে যেন বলে উঠল, —খাওয়া পরা দিয়ে পয়সা লাগে না? হেমলতা ঠিক বুঝতে পারলেন না কথাটা কে বলল! একবার মনে হল দাদার গলা, একবার মনে হল বাবার। আবার মনে হল না, ওটা তাঁর কর্তারই গলা ছিল। হেমলতা ছটফট করে উঠলেন। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পারছেন না। নিজের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠছেন বার বার। তাঁর গা হাত পা ভর্তি দগদগে ঘা!

অন্ধকার ঘরে, ঘুম ভাঙার পরও, অনেকক্ষণ স্বপ্নটা লেগে রইল চোখে। ভোর হয়ে আসছে। সকালের মুখে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ে, তবু ঘামে ভিজে গেছে গোটা শরীর। হেমলতা উঠে মুখে চোখে জল দিলেন। তারপর দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

মেয়েটার মাথার কাছে বসে আছেন স্মৃতিকণা। হেমলতা ঘরে, ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দরজায়।

www.boiRboi.blogspot.com

বৃষ্টি নামার পরে

মিনিবাস থেকে নামতেই কাঁধের ব্যাগে সুরেলা ধ্বনি। চেন খুলে মোবাইল ফোনটা বের করল ঝুমুর। যা ভেবেছে তাই। রাহুল। উফ্, কলেজে ঢোকার মুখে ওই নাছোড় ছেলেটার প্যানপ্যানানি শুনতে হবে এখন?

কাল রাত থেকে খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজ আরও তেতো হয়ে গেল ঝুমুরের। ফুটপাথে উঠে বোতাম টিপে খুদে যন্ত্রটা চাপল কানে। নীরস গলায় বলল,

"হ্যাঁ বল।"

"কী করছিস তুই আজ?"

"কিউ?"

"তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"বোর করিস না। এখন পরপর তিনটে ক্লাস। বিজি থাকব।"

"বিকেলে একবার মিট করতে পারবি?"

"জানি না।"

বলেই ঝুমুর পুরোপুরি নিথর করে দিল ফোনটাকে। কলেজে ঢোকার আগে রোজই সুইচ অফ করে, আজ আরও আগে করলে ভাল হত।

নিমপাতা খাওয়া মুখে কলেজ গেটের দিকে এগোল ঝুমুর। সত্যি, পারেও বটে রাহুলটা! মেডিকেলের ফোর্থ ইয়ার চলছে, কোথায় এখন

ঘাড় গুঁজে বই-এর অক্ষর চাটবি, তা নয়, খালি উড়ু-উড়ু ভাব। গত বছর ঝুমুরদের কলেজে ডিবেট কম্পিটিশনে এসেছিল রাহুল। কালচারাল কমিটিতে থাকার সুত্রে তখনই ঝুমুরের সঙ্গে আলাপ। তারপর থেকে বিলকুল ফেভিকল হয় সেঁটে আছে। হুটহাট হানা মারছে ঝুমুরদের কলেজে। আর ফোন তো যখন তখন। রাত বারোটায়, ভোর ছ'টায়। সারাক্ষণ এক ক্যাসেট, ভাল লাগে না রে ঝুমুর, কিছু ভাল লাগে না। আরে, তোর কিছু ভাল না লাগলে ঝুমুর কী করবে? তোমার সঙ্গটি ঝুমুরের মন্দ লাগে না, তাই ঝুমুর তোমায় পাত্তা দেয়। তা বলে মনে-মনে কিছু এঁচে নিয়ে ঝুমুরের সঙ্গে যদি চাঁদ-তারার ছক কষে থাকো, তবে সে গুড়ে কেজি-কেজি বালি। ইশ্‌ক বস্তুটি যে কী খতরনাক, ঝুমুর হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে। বাড়িতে একজোড়া স্যাম্পেল রয়েছে না? তাদের দেখছে না রাতদিন? কথাটা মনে হতেই ঝুমুরের বুকের ভিতর দিয়ে একটা শিরশিরে বাতাস বয়ে গেল। আজ সেই জুটির বাইশতম বিবাহবার্ষিকী। অথচ সকাল থেকে একবারও উইশ করেনি ঝুমুর। প্রবৃত্তি হয়নি। কাদের শুভেচ্ছা জানাবে? দুই লড়ুয়ে মোরগ-মোরগাকে? কী বলবে? দিনটা বারবার ফিরে আসুক, তোমরা প্রাণ ভরে ছুরিতে শান দাও। পরস্পরের ফাঁক-ফোকর খোঁজাই যাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তুচ্ছ কারণে যারা আঁচড়াআঁচড়ি করছে সারাক্ষণ, তাদের আবার বিবাহবার্ষিকী! ফুঃ! নাহ্, ওদের কথা আর ভাববেই না সারাদিন। কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকে ঝুমুর এক ঝলক দেখল আকাশটাকে। মাথার উপর ঘন শ্রাবণ। থই-থই করছে পাঁশুটে মেঘ। সবে সাড়ে এগারোটা বাজে, এর মধ্যেই কেমন ম্লান হয়ে গেছে চারিদিক। প্রকৃতিও কি বুঝে ফেলেছে ঝুমুরের আজ মন ভাল নেই?

কলেজে এসে মুখ ভেটকে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আওয়াজ মেরে-মেরে জিনা হারাম করে দেবে বন্ধুরা। অলস ভঙ্গিমা বদলে ঝুমুর হাঁটার গতি বাড়াল। সিঁড়ি টপকে মেন বিল্ডিংয়ের লম্বা টানা করিডোর পৌঁছে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিল চটপট। চলতে-চলতে কী ভেবে একবার

www.boiRboi.blogspot.com

পরখ করল ব্যাগটাকে। যাক বাবা, ফোল্ডিং ছাতাখানা আছে। কালকের মতো বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না।

অনার্সের পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে। ডায়াসে এস কে এম, রোল কল শেষ, হাতে অতি পরিচিত সেই হলুদ ঠোঙা। আদ্যিকালের নোট নিষ্প্রাণ স্বরে পড়ে চলেছেন স্যার। টুঁ শব্দটি না করে পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল ঝুমুর। খাতা খুলে চেষ্টা করল নোট লেখার। দু'-চার মিনিটেই ধৈর্য খতম, আনমনা হয়ে যাচ্ছে চোখ-কান। কাল রাতেও কী বিশ্রী একটা ধুন্ধুমার বাধাল দু'জনে! পারেও বটে! এদিকে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না, অথচ সন্ধেবেলা দু'জনে দু'জনের জন্য উপহার এনেছে ঘটা করে! হাইট অফ ভণিতা আর কাকে বলে!

ক্লাসরুম মুছে যাচ্ছে চোখ থেকে। ঝুমুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল কালকের সন্ধেটাকে। জলদি-জলদি বাড়ি ফিরে এসেছে ফুয়েরার, হার হাইনেসের মেজাজও কুলপিমালাই। স্বহস্তে দুধ-কফি বানালেন মা, বোতল না খুলে বসে বাবাও চুমুক দিচ্ছেন কফিতে, টিভি সিরিয়াল দেখতে-দেখতে দিব্যি টিপ্পনি চলছে টুকটাক। উপহার দেওয়া নেওয়া করে দু'জনের মুখেই বেশ খুশি-খুশি ভাব। এমন সুখের দৃশ্য বাড়িতে একেবারেই দেখা যায় না তা নয়। তবু ঝুমুরের কেমন-কেমন লাগছিল। এত ভাব টিকলে হয়! হলও তাই। সবে বেডসুইচ নিভিয়ে চোখের পাতাটি বুজেছে ঝুমুর, পাশের বেডরুমে যুদ্ধের দামামা। প্রথমে চাপা সুরে, ক্রমশ চড়ছে পরদা। "হঠাৎ আমার জন্য টাই কিনতে গেলে কেন? তাও আবার ওরকম ঝিনচ্যাক কালারের?" "রঙচঙে ড্রেস তুমি পরো না বুঝি? টাইটা ঝুলিয়ে নয় আরও খোকা সেজো।"

"বটেই তো! খুকির বরকে তো খোকা সাজতেই হয়!"

"কী?। কী বললে? আমি খুকিপনা করি, অ্যাঁ?"

"রাতদুপুরে ফ্যাচ-ফ্যাচ কোরো না তো, শান্তিতে শুতে দাও।"

"পুট করে একটা হুল ফুটিয়ে ভোঁস-ভোঁস নাক ডাকাবে, সেটি তো চলবে না। বলতে হবে কী খুকিপনা করেছি! নইলে...নইলে..."

"নইলে কী?"

"তোমার সোহাগ দেখিয়ে কিনে আনা রিস্টওয়াচ ডাস্টবিনে ফেলে দেব।" "দিতেই পার। এ তো আর সমীরণ ঘোষের উপহার নয় যে, বুকে জড়িয়ে রাখবে!" "ইতর! ইতর! সন্দেহ করেই গেলে। তুমি সমীরণের পায়ের নখের যুগ্যি নয়, বুঝেছ?" "ঠিকই তো। পরের বউয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করার আর্ট তো আমি শিখিনি।"

"আহা, মরে যাই! বেড়াল বলে, মাছ কীভাবে খাব গো! তুমি যে কী চিজ তা কি আমার অজানা? গত মাসে কাকে নিয়ে তুমি বকখালিতে গেছিলে, অ্যাঁ? অফিস টুরের নামে কোথায় কখন ফুর্তি মেরে আসো, টের পাই না ভেবেছ?"

"দ্যাখো, নিজেই দ্যাখো সন্দেহবাতিকটা কার। আমার পিছনে টিকটিকিগিরি না করে নিজের ছেনালপনাটা আগে বন্ধ করো। ভুলে যেও না. ঝুমুর বড় হয়ে গেছে। কোথায় কখন কার সঙ্গে আশনাই করে বেড়াও মেয়ে সব টের পায়।"

"মেয়ে তার ডিবচ বাপকেও চেনে। তুমি যে কোন নর্দমার কীট..."

এরপর বিশুদ্ধ স্ল্যাং। ভাষা বস্তির, মাধ্যমটা শুধু ইংরেজি। চোখা-চোখা বিশেষণগুলো শুনে বিশ্বাস করা শক্ত এঁরা একসময় পরস্পরের প্রেমে ফিদা ছিলেন!

কবে থেকে মা-বাবার সম্পর্কটা এত বিষাক্ত হয়ে গেল? কেন হল? সমীরণকাকুর সঙ্গে সত্যিই কি মার কোনও অ্যাফেয়ার আছে? ঝুমুরের তো বিশ্বাস হয় না। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে সমীরণকাকুকে দেখছে, বাবারই বন্ধু, দরকারে অদরকারে ডাকলেই ঝুমুরদের পাশে আছেন। এবং যথেষ্ট ভাল লোক! রগুড়ে, উইটি, গলা ছেড়ে হাসতে পারেন। বাবার চেয়েও মা'র সঙ্গে এখন সমীরণকাকুর বেশি র‍্যাপো, তাই কি বাবা হিংসেয় জ্বলেন? বাবাকেও কি আদৌ লম্পট, চরিত্রহীন বলে ভাবা যায়? অফিস-অফিস করে একটু বেশি ব্যস্ত থাকেন বাবা, কোম্পানি নাকে দড়ি দিয়ে ছোটায় অনবরত।

www.boiRboi.blogspot.com

টেনশনে-টেনশনে বাবার তো শুগার ধরে গেল। বউ মেয়েকে অঢেল সময় দিতে পারেন না বলেই বাবা ভিলেন? যত্রতত্র লটঘট করে বেড়াচ্ছেন? কী আজগুবি ধারণা! আর যদি দু'জনের সন্দেহই সঠিক হয়, তা হলে তো ধরতে হবে কোথাও একটা ফাঁকা জায়গা ছিলই, সম্পর্কের মাঝে। একটু-একটু করে বড় হয়েছে ফাটলটা। এবং প্রকৃতি তো শূন্যস্থান রাখে না, কেউ না কেউ সেখানে ঢুকে পড়বেই।

ঝুমুরের আজকাল মাঝে-মাঝে মনে হয়, বাবা-মা এখনও একসঙ্গে থাকেন কেন? রোজ-রোজ একে অপরকে ছোবল মারার চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াই তো ভল। যত দিন না ঝুমুর পাশটাস করছে, চাকরিবাকরি পাচ্ছে, টাকা পাঠিয়ে দিন, আরামসে কোনও হস্টেলে থেকে যাবে ঝুমুর। সুখের চেয়ে স্বস্তি ঢের-ঢের ভাল।

কথাটা একবার ছোটমাসির কাছে পেড়েও ছিল ঝুমুর। উদ্বিগ্ন মুখে ছোটমাসি বলেছিলেন, "তুই আর ওদের খ্যাপামোকে উস্‌কে দিস না তো ঝুম। দিদি-জামাইবাবুর ভালবাসর নেচারটাই ওরকম। অ্যাগ্রেসিভ টাইপ।"

হবেও বা। তবে এই যদি প্রেম হয়, ঝুমুর জীবনেও তার ধারেকাছে ঘেঁষবে না। ভূতের কিল হজম করার সাধ ঝুমুরের অন্তত নেই। বেল পড়ে গেছে। মহামূল্যবান নোটের বানডিল গুছিয়ে প্রস্থান করছেন এস কে এম। এবার পরপর দু'টো পাসের ক্লাস। ফিলজফি। দোতলার ১৬ নম্বরে। তৃণা, দোয়েল, সুমনরা উঠে পড়ল বেঞ্চি ছেড়ে। ডাকছে ঝুমুরকে। ইস্, খোনা-খোনা গলায় পি এম ম্যাডাম ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে কচলাবেন এখন! ভাবতেই ঝুমুরের বিবমিষা জাগছিল। কায়দা করে বন্ধুদের এড়িয়ে সোজা চলে এল লাইব্রেরিতে। গোটাদু'য়েক দরকারি বই ইসু করে নিয়ে কয়েক পল দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কোথায় যে সে যায় এবার? ক্যান্টিনে? কমনরুমে? রিডিংরুমে গিয়ে বসবে দু'দণ্ড? ধুৎ, ভিড়ভাট্টা ভাল লাগছে না আজ, টুকটুক করে কেটে পড়াই ভাল। দুপুর -দুপুর বাড়ি ফিরলে ঘন্টাকয়েক তো বিন্দাস শুয়ে থাকতে পারবে।

শেষ বাসনাটাই মনঃপুত হল। পা চালিয়ে ঝুমুর ঝটিতি কলেজ গেটের বাইরে। বাসস্টপ অবধি পৌঁছতে পারল না অবশ্য, তার আগেই থমকে দাঁড়িয়েছে, রাহুল!

বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল ঝুমুর, "স্ট্রেট চলেই এসেছিস? যদি আমি চারটের সময় বেরোতাম?"

"পারতিসই না," রাহুল দাঁত বের করে হাসছে, "আজ আমার উইল ফোর্স কাজ করছে।"

"মানে?"

"এই তো, দশ মিনিটও কাটেনি...এর মধ্যেই কেমন টেনে বের করলাম তোকে!"

"হুঁ, ঝড়ে বক মরল, ফকিরের কেরামতি বাড়ল!"

"প্রোভার্বটা কার কাছে শিখলি? ঠাম্মা না দিম্মা?"

"ভাট বকা ছাড়।.... কী কথা আছে বলছিলি যেন?"

"হচ্ছে, হচ্ছে। তাড়া কীসের!" চোখ কুঁচকোল রাহুল। ঝুমুরকে নিরীক্ষণ করতে-করতে বলল, "মুড অফ?"

"তাতে তোর কী?"

"ম্যাজিকে মন ভাল করে দিতে পারি। যাবি আমার সঙ্গে? নন্দনে? একটা ঝক্কাস মুভি এসেছে।"

"কী ফিল্ম?"

"লাইফ ইজ বিউটিফুল। বেনিনি যা করেছে না, হাসতে-হাসতে কেঁদে ফেলবি।"

সিনেমাটার নাম ঝুমুরের শোনা। সামান্য দোটানায় পড়ে গেল ঝুমুর। বাড়ি না ফিরে ঠান্ডা হলে বসে থাকাই বা মন্দ কী! ছবিটা নাকি দুরন্ত মজার, মনের গুমোট কাটলেও কাটতে পারে।

"ও কে," ঝুমুর কাঁধ ঝাঁকাল, "কিন্তু যাবি কিসে? মেট্রো?"

www.boiRboi.blogspot.com

"অবশ্যই। এই ভ্যাদভ্যাদে গরমে বাসে ওঠে কোন বুরবক!"

সত্যি হিউমিডিটির মাত্রাটাও যেন ঝপ করে চড়ে গেল আজ। ঝুলবর্ণ আকাশখানা এখন স্কাইস্ক্র্যাপার ছুঁই-ছুঁই। রুপোলি ঝিলিক হানছে ঘনঘন। ঈষৎ তেরচা চোখে মেঘেদের সাজগোজ দেখতে-দেখতে হাঁটতে শুরু করল ঝুমুর। কানের পাসে রাহুলের একটানা বকবক। আজ অবশ্য ক্যাসেট পালটেছে। একঘেয়ে প্যানপ্যানানির বদলে অ্যানাটমিরুমের কাহিনি। ঝুমুর শুনছিল ভাসাভাসাভাবে, মাঝেমধ্যে হুঁ, হাঁ করছিল। তাতে অবশ্য রাহুলের ভ্রুক্ষেপ নেই, একা-একাই চালিয়ে যাচ্ছে সংলাপ। সাধে কি ঝুমুরের ধারণা ছেলেটার মাথায় ক্যাড়া আছে! পাতালরেল স্টেশন বেশ ফাঁকাই। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ব্যাগ থেকে টাকা বের করছিল ঝুমুর, তার আগেই কাউন্টারে হাত গলিয়ে দিয়েছে রাহুল, "দুটো রবীন্দ্রসদন দেবেন তো!"

ঝুমুর দুম করে রেগে গেল। গুমগুমে গলায় বলল, "এটা কী হল?"

"কী?"

"দেখলি আমি চেঞ্জ বের করছি, তুই আগ বাড়িয়ে টিকিট কাটলি কেন?"

"যাহ্ বাবা! দোষের কী হল?"

"আমি পছন্দ করি না। শিভালরি দেখানোর মেন্টালিটিটা ছাড়।"

"চটছিস কেন? লেট্স শেয়ার। সিনেমার টিকিটটা নয় তুই কাটিস। অবশ্য তোরই লস তা হলে! মাল্লু বেশি খসবে।" রাহুল হ্যা হ্যা করে হাসল।

লাগসই একটা জবাব দিতে যচ্ছিল ঝুমুর, তখনই প্ল্যাটফর্মে ট্রেন। লাফাতে-লাফাতে ভূতলে নামল দু'জনে, দরজা বন্ধ হওয়ার মুখে-মুখে সেঁধিয়ে গেছে কামরায়। ট্রেন ছাড়তেই আবার নিজের কলেজের প্রসঙ্গটা তুলছিল রাহুল, ভাঁজ মেরে লাইন ঘুরিয়ে দিল ঝুমুর, "তোর ফাইনাল এগজাম কবে রে?"

"দেরি আছে। নেক্সট এপ্রিল।"

"কী করবি তারপর?"

"একটা বছর তো ফ্যাক খাটতে হবেই।"

"তারপর?"

"হাউসস্টাফ।"

"নোকরি। পরীক্ষাটরিক্ষা দিয়ে চলে যাব কোনও রুরাল হেল্‌থ সেন্টারে। পাহাড়ে, জঙ্গলে যে চুলোয় হোক!"

"বালাই ষাট। আসানসোলে তোর বাবার এত বড় রোরিং প্র্যাকটিস, ঘ্যাম নার্সিংহোম, কোন দুঃখে তুই গর্ভনমেন্ট জয়েন করবি রে?"

"আসানসোলে আমি থাকব না ঝুমুর।"

"কেন?"

"ইচ্ছে। আই হেট দ্যাট প্লেস।"

"সে কী রে? তুই না তোর বাবার একমাত্র লাডলা?"

"উহুঁ বাবার নয়, মা'র।"

ঝুমুর থতমত। অস্ফুটে বলল, "মানে?"

একটু যেন দূরমনস্ক দেখাল রাহুলকে। মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি, "ছাড় তো ওসব টপিক, ভাল লাগে না।"

আজ রাহুলের ভাল না লাগার সুরটা যেন অন্যরকম! কেমন যেন ভেজা-ভেজা! রাহুলের বাবা-মা'র কি ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে? ছেলেটার কথা শুনে তো কখনও বোঝা যায়নি বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই? হুম্, এখন যেন মনে পড়ছে বাবার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে রাহুল যেন একটু বাঁকাভাবেই জবাব দিয়েছিল! হেঁয়ালি, হেঁয়ালি! খোলাখুলি প্রশ্ন করবে? থাক, ছেলেটা হয়তো আহত হতে পারে।

ট্রেন চলছে, থামছে, চলছে। মাইক্রোফোনের ঘড়ঘড়ানিতে ঘোষিকার উচ্চারণ বোঝা দুষ্কর। চাঁদনি চক পেরনোর পর কামরায় ভিড়ও বেড়ে গেল বেশ। এসপ্ল্যানেডে তো রীতিমতো ঠাসাঠাসি।

www.boiRboi.blogspot.com

রাহুল এক বৃদ্ধাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে সুড়ঙ্গপথে আলো-আঁধারের খেলা, রাহুলের দৃষ্টি এখন সেদিকে। চোরা চোখে রাহুলকে দেখছিল ঝুমুর। বুকের ভিতর ফের সেই শিরশিরে বাতাস বয়ে চলে কেন? হিম হিম? বাষ্পামাখা?

হঠাৎ রাহুল ডাকল, "অ্যাই চল, নেমে পড়ি।"

"রবীন্দ্রসদন এসে গেল নাকি?"

"এসে যাবে। নাম তো, চটপট, চটপট।"

রাহুলের তাড়া খেয়ে প্ল্যাটফর্মে পা রেখেই ঝুমুরের চোখ বড়-বড়, "ওমা, এ তো ময়দান।" "জানি," রাহুলের হাসি ফিরে এসেছে, "বাকি পথটা হেঁটেই মেরে দিই চল।"

"অতটা এখন হাঁ টব?"

"এটুকু পয়দল মারলে পা ক্ষয়ে যাবে না ম্যাডাম।"

"শো কিন্তু আরম্ভ হয়ে যাবে রাহুল।"

"তো? নয় একটু দেরিতে ঢুকব। নয়তো..." রাহুল বাক্য সম্পূর্ণ করল না, ঝুমুরের কবজি ধরে টানছে, "আয় আয়।"

ঝুমুর ছাড়াতে পারল না হাতটা। কেন যে জোর পাচ্ছে না? ওই শিরশিরে বাতাসটার জন্যই কী? প্রায় টানতে-টানতে ঝুমুরকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এল রাহুল। চরাচর এখন ঘোর মসিবর্ণ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

"ওয়াও!" রাহুল দারুণ উচ্ছ্বসিত, হাত বাড়িয়ে ছুঁল বৃষ্টিকে। ছটফটে ভঙ্গিতে বলল, "চল ঝুমুর ভিজতে ভিজতে যাই।"

ঝুমুর বলল, "খামোখা ভিজতে যাব কেন? আমার কাছে ছাতা আছে।"

"দূর, এই বৃষ্টিতে ছাতা খোলে বুড়োবুড়িরা। চল তো।"

"তারপর হেঁচে-কেশে মরি আর কী!"

"নো চিন্তা। সঙ্গে একটা হাফ ডাক্তার তো আছে।"

কী কাণ্ড, ঝুমুরও আর প্রতিবাদ করতে পারল না কোনও! রাহুলের হাতে হাত রেখে নেমে এল বৃষ্টিতে। হাঁটছে পাশাপাশি। গুঁড়ো-গুঁড়ো জলকণা মাখছে গায়ে। নীরবে।

রাহুলও কথা বলছিল না কোনও। আবার যেন অনেক কিছু বলছিলও। নিঃশব্দে। একটু-একটু করে বাড়ছে বৃষ্টি, বড় হচ্ছে দানা, ঝিমঝিম ঝরে চলেছে অবিরাম। বৃষ্টিধারার ওপারে চেনা শহরটাকে এই মুহূর্তে অচিন লাগে। স্বপ্ন স্বপ্ন। যেন মানুষজন, ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া, গাছপালা সবই আবছা ক্রমশ। যেন ঘষা কাচের ঘেরাটোপে অন্য এক অলীক নগরীর পথ চেয়ে অজানা কোথাও চলেছে দু'জনে।

কেন এমন ঘোর-ঘোর লাগছে? ঝুমুর কি প্রেমে পড়ে গেল?

নিজেকে জোর করে ঝাঁকিয়ে নিল ঝুমুর। বুঝিবা ফিরতে চাইল বাস্তবে। কথা বলার জন্যই কথা বলল, "কী রে, বোম মেরে গেছিস যে?"

"উঁ?"

"কী যেন বলবি বলছিলি?"

"বলব?"

"শুনছি তো, বল।"

রাহুল চুপ মেরে গেল আবার। বুঝি কথাগুলো গোছাচ্ছে মনে-মনে। আরও জোরে আঁকড়ে ধরল ঝুমুরের আঙুলগুলো। তারপর হঠাৎই ঘড়ঘড়ে স্বর ফুটেছে, "তোর জন্য আমার খুব মন কেমন করে রে ঝুমুর। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর।"

এরকম একটা কিছু যে শুনবে, ঝুমুর তো জানতই। তবু যে কেন বুকটা ধক করে উঠেছে! চোখ নামিয়ে ঝুমুর বলল, "কিন্তু....কিন্তু... আমি যে..."

"কী?"

"আই ডোন্ট বিলিভ ইন লাভ।"

"কেন রে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"কারণ, প্রেম বলে কিছু এগজিস্টই করে না। ভালবাসা শব্দটাই একটা বকওয়াস।"

"কী করে জানলি? এক্সপিরিয়েন্স আছে বুঝি?... "সেকেন্ডহ্যান্ড। নিজের বাবা-মাকেই তো দেখছি।" ঝুমুর বলব না বলব না করেও বলে ফেলল, "জানিস আজ আমার বাবা-মা'র বিয়ের দিন।"

"তাই নাকি? আজ তো তা হলে একটা মোমোরেবল ডে!"

"আমার জন্য নয়। কেন যে ভুল দিনটা আসে প্রত্যেক বছর!"

রাহুল কতটা কী বুঝল কে জানে আবার চুপ। ঘাড় তুলে চোখে, গালে, কপালে বৃষ্টি মাখল একটুক্ষণ। মুছেও নিল মুখ। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য হাসি, "ওদের কথা কি এই মোমেন্টে বাদ দেওয়া যায় না ঝুমুর? আয় না, আমরা শুধু আমাদের কথা বলি।"

পূর্ণ দৃষ্টিতে রাহুলের দিকে তাকাল ঝুমুর। মনে-মনে বলল, "কিন্তু আমরা যদি পরে ওদের মতোই হয়ে যাই? যদি ভালবাসা উবে যায়?

যদি....যদি...?"

না, একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না ঝুমুর। শ্রাবণ এখন তার চোখেও ভর করেছে যে! বৃষ্টি আর কান্না একাকার হয়ে গেলে কি আর কোনও শব্দ ফোটে গলায়!

সমালোচক

ট্রেনে উঠেই স্নিফার ডগের মতো কামরাটাকে শুঁকছিল অঞ্জন। চোখ ঘুরছে বনবন। একটা পছন্দসই সিট খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষুনি। দমদম এসে গেলে হুড়ুদ্দুম ভিড় হয়ে যাবে কামরায়, দখলটা নিতে হবে তার আগেই।

ঠিক তখনই চেনা গলার ডাক,—অ্যাই অঞ্জন, এদিকে আয়.....এখানটায়।

অঞ্জন ঘুরে তাকাল। রজত। স্কুলের বন্ধু। সেল্‌স লাইনে ঘসটাচ্ছে। এখন চষে বেড়ায় গোটা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট। নিত্যযাত্রী হওয়ার সুবাদে ইদানীং মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যাচ্ছে রজতের সঙ্গে। বেড়ে জায়গাটা আজ ম্যানেজ করেছে ব্যাটা! হাওয়া ফুরফুর জানলার ধার! শেয়ালদা থেকে ট্রেনে ওঠার সুবিধেটুকু ব্যাটা উশুল করে নিচ্ছে পুরো মাত্রায়।

অঞ্জন দেঁতো হেসে রজতের সামনে এল। সিটে তিনজন আছে, চেপেচুপে বসে পড়ল রজতের পাশটিতে। আলগা ভাবে বলল,—তুই আজ এই ট্রেনে? কাছেপিঠে যাবি বুঝি?

—হ্যাঁ রে। আজ কল্যাণী। পেছনে নামলে সুবিধে হয়, তাই আর এগোলাম না। কোলের ব্রিফকেসখানা খুলে খবরের কাগজ বার করল রজত,—তুই আজ এই কামরায় যে বড়? তোর ঠেক তো আরও সামনে! ভেন্ডারের আগেরটায়।

www.boiRboi.blogspot.com

—বেরোতে আজ লেট হয়ে গেল। তার ওপর শালা বাসটাও এল টিকিয়ে টিকিয়ে। অফিসটাইমেও শালাদের খাঁই মিটতে চায় না..... যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে প্যাসেঞ্জার তুলছে। ট্রেনটাই মিস করে যেতাম। কোনও রকমে ছুটতে ছুটতে এই লাস্ট কম্পার্টমেন্টটা.....

—তার মানে আজ তোর তাসখেলা গন্?

—অগত্যা।

বুকপকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা মুছল অঞ্জন। ঝলক দেখে নিল পাশের সহযাত্রিনীটিকে। মাঝবয়সী। রাগী রাগী দিদিমনি টাইপ চেহারা। ভুরু বেশ কুঁচকে আছে, বসতে অসুবিধে হচ্ছে বোধহয়। কেন যে লেডিজ কম্পার্টমেন্ট থাকতে এরা এখানে এসে গুঁতোয়! ইচ্ছে করে বডিটাকে সিটের আর একটু ভেতরে ঢুকিয়ে দিল অঞ্জন। ডানহাতখানা ছড়িয়ে দিয়েছে রজতের কাঁধের পিছনে।

চোখ জানলায়। শহরতলির শোভা দেখছে।

দমদম আসতেই সেকেন্ডের মধ্যে ভরে গেল কামরা। সিটের মাঝের প্যাসেজগুলোতেও সেঁধিয়ে গেছে লোকজন। বাজপাখির চোখে দেখছে কোথায় একটু পাছা ঠেকানো যায়।

তার মধ্যেই দিব্যি খবরের কাগজ গিলে যাচ্ছে রজত। নির্বিকার মুখে। ট্রেন নড়ে উঠতেই কনুই দিয়ে খোঁচা মারল একটা,—অ্যাই, নিউজটা দেখেছিস?

—কী রে?

—এক গভর্ণমেন্ট অফিসার ধরা পড়েছে। সেন্ট্রালের। ব্যাটা ঘুষ নিচ্ছিল, হাতেনাতে পাকড়াও।

—কোথায়? কলকাতায়?

—খোদ ক্যাপিটালে। হাই র‍্যাংকের ইঞ্জিনিয়ার। ঠিকাদারকে কনট্র্যাক্ট পাইয়ে দেবে বলে তিন লাখ চেয়েছিল। ঠিকাদারটাও তেমনি খচ্চর,

ব্রিফকেসে নোটও এনেছে, এদিকে সি-বি-আইকেও নেড়ে দিয়ে এসেছে। ব্যস্, অন দা স্পট ক্যাঁক। টাকার বদলে এখন লপ্‌সি খা, আর ঘানি ঘোরা।

—ছাড় তো। থোড়াই শাস্তি হবে। ঠিক জাল কেটে বেরিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, হাই ফাই ইঞ্জিনিয়ারের হাই অ্যামাউন্ট খসবে, এই যা।

—আরে না। সি-বি-আইকে ম্যানেজ করা অত সহজ নয়। আচ্ছা আচ্ছা মিনিস্টারদের ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেয়।

—রাখ তো, সি-বি-আই, ফি-বি-আই সব জানা আছে। কেউ স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু নয়। অঞ্জন ঠোঁট বেঁকাল,—আমাদের অফিসের অনিমেষবাবুর ভায়রার কেসটা তো দেখলাম।

—কী কেস?

—সেম কেস। ঘুষ। খবরটা সব কাগজে বেরিয়েছিল। ফ্রন্টপেজ নিউজ। একটা পেপারে তো ছবিও ছাপা হয়েছিল। হাতে হাতকড়ি বাঁধা রাজ্য সরকারি অফিসার!

—মনে হচ্ছে যেন দেখেছি। কবে বেরিয়েছিল বল্ তো?

—তা প্রায় হবে বছর চার পাঁচ।

—ঘটনাটা বল্।

—সে এক কেলোর কেলো। লোকটা হেব্বি চালাক ভাবত নিজেকে, বুক ফুলিয়ে নোট খেত। রীতিমত পার্টিদের ওপর টরচার করত বলতে পারিস। তো এক পার্টি দিল ভিজিলেন্স লেলিয়ে। ভিজিলেন্সের হাতে লোকটা লিটেরালি কট রেড হ্যান্ডেড।

—কী রকম?

—নোটের বান্ডিলে কী সব যেন কেমিকাল মাখিয়ে দিয়েছিল ভিজিলেন্স। ইন ডিসগাইস ওৎ পেতে বসে ছিল স্পটে। যেই না বাবু নোটের তাড়া হাতে নিয়েছে, ছদ্মবেশী গোয়েন্দারা ঘ্যাঁক করে চেপে ধরেছে হাত। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে যেই না হাতটি চুবিয়ে দিয়েছে জলে, সঙ্গে সঙ্গে জল লাল। ব্যাপারটা বুঝলি তো?

www.boiRboi.blogspot.com

—হুম্। কেমিকাল রিঅ্যাকশান।

—অ্যাট দা সেম টাইম নোটের ওপরেও বাবুর হাতের ছাপটি পারমানেন্ট হয়ে গেল। আর পালাবার পথ নেই। জানিস তো, ব্যাটা খুব ভুগেছে। তিন তিন বার জামিনের পিটিশান রিজেক্ট করে দিয়েছিল কোর্ট। টানা চার সপ্তাহ পুলিশ কাস্টডিতে ছিল ভায়রাবাবুটি। পুলিশ কাস্টডি মানে বুঝেছিস তো? চুটিয়ে হাতের সুখ করেছে পুলিশ।

—সে কী রে? পুলিশ পেটাল? গভর্ণমেন্ট অফিসারকে? ঘুষ খাওয়ার অপরাধে? হোয়াট এ জোক!

—কারণও ছিল। অ্যারেস্ট হওয়ার পর ভিজিলেন্সকে নাকি খুব শাসিয়েছিল ব্যাটা। পুলিশ কাস্টডিতে বসেও কপচাত খুব। এই মন্ত্রীর সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে, ওই মিনিস্টারের পি-এ আমার বোতলের ইয়ার, একবার ছাড়া পাই তারপর আপনাদের খবর নিচ্ছি.....! ওই বুকনি শুনে লোকে পুজো করবে? আরও আছে। ভিজিলেন্সের লোক কোমরে দড়ি বেঁধে ভায়রাবাবুকে নিয়ে গেছিল তার ঘ্যামচ্যাক ফ্ল্যাটে। সেখানে বাথরুমেও নাকি কালার টিভি! ..... ভাব তুই সিচয়েশানটা! পাড়াপড়শি হাসাহাসি করছে, আত্মীয়স্বজন ছ্যা ছ্যা করছে ..... লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলের কী চরম বেইজ্জতি। আমাদের অনিমেষবাবু তো দু হাত তুলে নেচেছিলেন। বলতেন, অঘটন আজও ঘটে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অনিমেষবাবুদের নাকি খুব হ্যাটা করত ওই ভায়রাভাই। ইনফ্যাক্ট, পয়সার গরমে কোনও রিলেটিভকেই নাকি পাত্তা দিতে না বিশেষ। মানে ভেড়া ছাগল মনে করত। একটা ইন্সিডেন্টে লপচপানি খতম, মাথা একেবারে গোবরে। অঞ্জন থামল একটু। থেমেই রইল। তারপর ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলল,—তা সেই ভায়রাবাবুটির এখন কী হাল আন্দাজ কর তো?

রজত সামান্য ভেবে নিয়ে বলল,—কোর্টে নিশ্চয়ই কিছু প্রমাণ করা যায় নি! উকিল লাগিয়ে ছয়কে নয় করে দিয়েছে!

—তোর মাথা। কেস কোর্টেই ওঠে নি। চার্জশিট একটা ফ্রেম হয়েছিল বটে, তবে এখনও থিং ইজ আন্ডার ধামা। কায়দাকানুন করে হাইকোর্ট থেকে বেল পেয়েছিল, তারপর থেকে দু হাতে রজতমুদ্রা ছড়িয়েছে। এবং খোদ মন্ত্রীর নির্দেশে সম্প্রতি তার সাসপেনশেনও উইথড্রন। তিনি আবার বহাল হয়েছেন চাকরিতে। আবার গুলি ফোলাচ্ছেন, তেল ঢালছেন, আবার শুরু হয়েছে হম্বিতম্বি। তবে এবার খানিকটা রেখে ঢেকে। কোথায় কোথায় বেলপাতা দিয়েছে নিশ্চয় গেস্ করতে পারছিস?

—হুম্। করাপশান। চরম দুর্নীতি। দেশটা চোর ডাকাতে ভরে গেছে। ফ্রম টপ টু বটম। রজত খবরের কাগজটা মুড়ে রাখল,—আমিও সেদিন একজনের গল্প শুনছিলাম। সে এক পিকিউলিয়ার ঘুষখোর। ক্যাশ খায় না, কাইন্ডস্ চায়। আবার জিনিসগুলোও তার ঘরে যায়, তা নয়। অফিসেই লোক ফিট করা আছে, তার থ্রু দিয়েই সব বিক্রি করে বিক্রির টাকাটা নেয়। আর একজন তো শুনেছি পার্টিদের কাছ থেকে পাওয়া ডায়েরিও গোছা করে ঝেড়ে দেয় বাজারে। এমনকি সিগারেটের প্যাকেটও বেচে।

—ছ্যাঁচড়া ছ্যাঁচড়া, গভর্ণমেন্টের লোকগুলো সব রাম ছ্যাঁচড়া।

—শুধু গভর্ণমেন্টের লোকদের কেন দোষ দিচ্ছেন ভাই? প্রাইভেটের লোকরা বুঝি সাধুসন্ত? সামনে দাঁড়ানো আধবুড়ো লোকটা ফস্ করে নাক গলিয়েছে কথায়,—সেখানে হচ্ছে না? ঘুষ চলছে না?

—তা তো বলি নি দাদা। অঞ্জন হাসল একটু,—দু নম্বরি তো সর্বত্রই। গভর্ণমেন্ট সেক্টরে একটু বেশি, এই যা।

—বেশি কম বুঝি না। যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই হাত্তাবাজি চলছে। কোন অংকের কটা বিজনেস লোন কাটমানি ছাড়া মেলে ভাই? কোন্ প্রাইভেট অফিসে অর্ডার ধরতে গেলে পয়সা ছড়াতে হয় না? বিল আদায় করতে গেলেও তো গান্ধীজির মুখ দেখাতে হয়। ঠিক কিনা?

—তা ঠিক। রজত মাথা দোলাচ্ছে,—এই যে আমি ডিস্ট্রিবিউটারদের ঘরে ঘরে ঘুরি, তাদের তুষ্ট রাখার জন্য আমাকেও কি মাঝে মাঝে গাঁটের

www.boiRboi.blogspot.com

কড়ি খরচা করতে হয় না? তো। বড় কোম্পানী তো নই, সেই সুযোগটা নেয়। স্কুইজ করে। পারসোনাল গিফ্‌ট নিয়ে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে হয়। এও তো কাইন্ড অফ ঘুষ।

—বটেই তো। যার যেখানে যেটুকু ক্ষমতা আছে, সেটুকু দেখিয়েই এক্সট্রা কামাই। গভর্ণমেন্ট সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, রাজনীতির জগত, সমাজসেবার দুনিয়া সর্বত্রই শুধু টাকার খেল্।

—আর সাফার করছি আমরা। সাধারণ মানুষরা। শুধু বেআইনি টাকার লেনদেনটা বন্ধ করা গেলে কী বিপুল সামাজিক অপচয় রুখে দেওয়া যায় ভাবতে পারেন? যদি কন্ট্রাকটারকে কাটমানি দিতে না হয়, তাহলে সে হয়তো রাস্তাটা একটু ভাল বানাবে। ব্যবসায়ীকে যদি ঘুষ দিতে না হয়, তাহলে হয়তো জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমবে.....

—এটা কি একটু বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে না ভাই? যারা নাফা ছাড়া কিছু বোঝে না, তারা তো ওটাকেও কামাই-এর মধ্যেই ঢুকিয়ে নেবে। নয় কি?

—কী জানি, আমার তো মনে হয় .....

গরম গরম আলোচনার মাঝেই একের পর এক স্টেশন পেরোচ্ছে ট্রেন। একদম শেষে বলে এ কামরা থেকে নামছে অনেক, উঠছেও নেহাত কম নয়। রাগীমুখ দিদিমনি নেমে গেল ইছাপুরে, তার জায়গায় জমিয়ে বসল দন্ডায়মান তার্কিক। লোকটা অল্প অল্প ঠেলছে অঞ্জনকে, আয়েশ করে বসার জন্য। অঞ্জনও বসে আছে চেপে, এক কণা জায়গা ছাড়তে সে রাজী নয়।

কামরায় আনাগোনা করছে হকাররা। মানুষের জঙ্গল ভেদ করে। তাদের বিচিত্র চিৎকারে কোলাহল আরও সরগরম। শ্যামনগর থেকে উঠল এক ছোকরা চা-অলা, ভিড় ঠেলে ঠেলে সেও এসেছে এপাশে। হাতে ঝোলানো খুদে উনুনের ওপর কেটলি, প্লাস্টিকের গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে চা, খাচ্ছে কেউ কেউ।

রজত জিজ্ঞেস করল,—কী রে, গলা ভেজাবি নাকি?

উত্তর না দিয়ে অঞ্জন বলল,—লক্ষ কর বদমাইশিটা। এখানেও কেমন টাকার খেলা চলছে!

—মানে?

—রেলকোম্পানী ট্রেনে সিগারেট খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে, কেউ ধোঁয়া ছড়ালেই খপ করে ধরছে। আমরা খাচ্ছিও না। কিন্তু ট্রেনে তো দাহ্যবস্তু ক্যারি করাও বেআইনি, অথচ চা-অলাটা দিব্যি আগুন নিয়ে ঘুরছে কী করে? নির্ঘাৎ রেলের লোকদের টাকা দিয়ে.....

—যাক গে যাক, গরীব মানুষ, নয় দু চার পয়সা কামালই।

—না না, এটা নীতির প্রশ্ন। যেদিন থেকে ট্রেনে সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে ওই চা খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি আমি।

রজত হেসে বলল,—তাহলে আমি একাই খাই?

—খা।

রজত চা নিল। দেখাদেখি পাশের তার্কিকও। ছোট্ট চুমুক দিয়ে লোকটা বলল?

—চুনোপুটিদের ছেড়ে রাঘব বোয়ালদের আগে দেখুন ভাই। .....আজকের খেলার পেজের নিউজটা পড়েছেন ভাল করে?

অঞ্জনের চোখ টেরচা,—কেন? কী আছে?

—বেটিং কেলেঙ্কারির। যে সব ক্রিকেটারদের আমরা মাথায় তুলে নাচি, দেখেছেন তাদের কান্ডকারখানা? পয়সা খেয়ে কেমন অবলীলায় তারা দেশকে ডুবিয়ে দিয়ে আসছে।

—আপনি আজহারউদ্দিন আর অজয় জাদেজার কেসটা বলছেন?

—মনোজ প্রভাকর তো আপাতত দুটো নামই করেছে।

—প্রভাকর নয়, হ্যান্সি ক্রোনিয়ে।

—ওই হল। .....যেই করুক, ধরে নেবেন না ওই দুজনই শুধু দায়ী, বাকিরা ধোয়া তুলসীপাতা। কে কখন সত্যি সত্যি শূন্য করছে, আর কে

www.boiRboi.blogspot.com

পয়সা খেয়ে জিরো করছে, তা কি আমরা বুঝতে পারছি? আমাদের টুপি পরিয়ে আখের গোছাচ্ছে না ছেলেগুলো?

—সে আর বলতে। অঞ্জন তৎক্ষণাৎ সায় দিল,—ইনোসেন্স, দেশপ্রেম এসব শব্দগুলোই কেমন ভেগ্ হয়ে গেছে। কোনও স্ফিয়ারে মরালিটি নেই, কাউকে আপনি আইডল ভাবতে পারবেন না। জানেন তো, শচীনের বিয়েতেও একগাদা জুয়াড়ি নেমন্তন্ন পেয়েছিল?

—আহা, শচীনকে এর মধ্যে আনছিস কেন? শচীন অত্যন্ত জেনুইন ছেলে।

—কে জেনুইন, কে ঝুটা, হু ক্যান সে? কপিল দেবকেও তো আমরা সাচ্চা বলে জানতাম। তার দিকে আঙুল ওঠে নি? যতই কেঁদেকেটে কপিল সাফাই দিক, ফাঁক তো কোথাও আছে নিশ্চয়ই? অভিযোগ তো আর আকাশ থেকে পড়ে না! টাকা পয়সার হিসেবও তো ঠিক মতো দিতে পারছে না শুনছি।

—সত্যি, খেলার জগতেও নোংরামি!

আবার জমে উঠেছে তর্ক। চলছে বাদানুবাদ। চলছে মতামত জাহির। চুলচেরা বিচার। দেখতে দেখতে কল্যাণী এসে গেল।

জাতীয় নায়কদের কাটাছেঁড়া করতে করতেই উঠে পড়ল অঞ্জন। প্রতিবাদ জানাতে জানাতে রজতও। হাত মুখ নেড়ে কথা বলতে বলতেই ট্রেন থেকে নেমেছে দুজনে। এগোচ্ছে প্ল্যাটফর্মের পিছন পানে।

হঠাৎই সামনে কালো কোর্ট। অঞ্জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল,—টিকিট?

বুকটা ধড়াস করে উঠল অঞ্জনের। প্রাণপণ চেষ্টায় গলা অকম্পিত রেখে বলল,—মান্থলি।

—কাইন্ডলি দেখাবেন একটু?

অঞ্জনের হৃৎকম্প বেড়ে গেল। বুকে নেহাই পড়ছে ঠকাঠক। অসহায় চোখে দেখল রজত এগিয়ে গেছে খানিকটা, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে এদিকে!

কালো কোর্ট গন্ধ পেয়ে গেছে। একটু কড়া গলাতেই বলল,—প্লিজ, তাড়াতাড়ি করবেন।

দুর্বল হাতে পিছনের পকেট থেকে পার্স বার করল অঞ্জন। খাপে রাখা মাসিক টিকিটখানা বাড়িয়ে দিয়ে আমতা আমতা স্বরে বলল, —ডেটটা.....মানে.....

—এ তো ন'দিন আগে ল্যাপস করে গেছে!

—মাঝে কদিন অফিসে আসি নি তো। মরিয়া হয়ে মিথ্যে বলল অঞ্জন, —আজ তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লাম.....এক্ষুনি করিয়ে নিচ্ছি।

—ওই সব কায়দার কথা অন্য জায়গায় মারবেন। আপনাদের ট্যাক্‌টিস আমরা জানি। প্রত্যেক মাসে আট দশ দিন করে এক্সট্রা খাইয়ে দেওয়া, অ্যাঁ?

—বিশ্বাস করুন, আমি প্রত্যেক মাসেই ঠিক সময়ে কাটি। এবারেই ....

—পুরোন মান্থলি আছে?

—ন্ ন্ ন্ না। মানে আমি রাখি না।

—বুঝেছি। টাকা বার করুন। এগারো টাকা ভাড়া, প্লাস হানড্রেড। একশো এগারো।

মহা ফ্যাসাদ হল তো! কোনও মাসে ধরা পড়ে না অঞ্জন, আজই.....? ইশ, সামনের দিকের কামরায় উঠলে সহকর্মীদের সঙ্গে ঠিক নির্বিবাদে পার হয়ে যেতে পারত। দল দেখলে কালো কোট ফিরেও তাকাত না।

মুহূর্তে অঞ্জন ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। বুকের ধড়ফড়ানিটাকে চাপা দিয়ে নীচু গলায় বলল,—আবার ফাইন টাইনের ঝামেলায় যাচ্ছেন কেন? কুড়ি টাকা রাখুন।

কালো কোট বিলবই খুলে ফেলেছে। ভাবলেশহীন গলায় বলল,—উঁহু, একশো এগারো। অঞ্জন আর একটু গলা নামাল,—তিরিশ হলে চলবে?

—না। একশো এগারো। চটপট করুন। চটপট।

www.boiRboi.blogspot.com

অঞ্জন ফিসফিস করে বলল,—বিল টিলের দরকার কী, পুরো পঞ্চাশই নিন।

—উঁহু, একশো এগারো। আমি ঘুষ টুস খাই না। কথা বাড়ালে ফাইনের অ্যামাউন্ট বেড়ে যাবে। দেবেন, না জি-আর-পি ডাকব?

পাংশু মুখে টাকাটা বার করল অঞ্জন। একশো এগারো নয়, একশো কুড়ি। রসিদের সঙ্গে গুণে গুণে তাকে ন টাকা ফেরত দিল কালো কোট। শীতল স্বরে বলল,

—আশা করি সামনের মাসে আর এ খেলাটা খেলবেন না। প্রপার ডেটে মান্থলি কাটবেন।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল কালো কোট।

অঞ্জন হাঁটছে গোমড়া মুখে। স্টেশনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল রজত, কাছে এসেছে। ব্যগ্র মুখে বলল,—কী রে, কী বলছিল?

—মান্থলির ডেটটা জাস্ট কভার করে গেছে, সেই চান্সটা নিয়ে ব্যাটা.....। অসম্মান ঢাকতেই বুঝি আচমকা বিস্ফোরিত হয়েছে অঞ্জন, —সতীপনা মারাচ্ছে! ঘুষ নিই না....শালা খানকির ছেলে.....।

—এই এই, মুখ খারাপ করছিস কেন? আরও সাতটা দিন কাটবি না, শোধবোধ হয়ে যাবে। একই লোক কি রোজ রোজ ধরা পড়ে নাকি? রজত চোখ টিপল,—আমি বাবা জোর বেঁচে গেছি। আমারও আজ টিকিট ছিল না।

অঞ্জন একটুও সান্ত্বনা পেল না। তেতো মুখে হাসার চেষ্টা করল সামান্য। পারল না। ধরা পড়া আর না পড়ার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদটা যে থেকেই যায়!

কালোসুখ

খাতা দেখতে বসেছিলাম। বি-এস-সি পার্ট টু। হেড এগজামিনারের তাগাদা আসছিল সকালবিকেল, তখনও বাষট্টিখানা বাকি, রাতটা সেদিন না জাগলেই নয়। ঘুম তাড়ানোর তোফা বন্দোবস্তও করে দিয়ে গেছে মানসী। টেবিলে কফি ভর্তি ফ্লাস্ক।

সবে তিন নম্বর খাতাটায় লাল কালির আঁচড় টানছি, ল্যান্ডফোন বেজে উঠল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও ঘর থেকে মানসীর হাঁক,—অ্যাই, ধরো।

—কে?

—তোমার এক্স কলিগ। অরিন্দম চৌধুরী। নামটা মগজে পৌঁছতেই আপনাআপনি কুঁচকে গেছে চোখ। সমান্তরাল লাইনের রিসিভার তুলে বললাম,—বলুন অরিন্দমদা। হঠাৎ এত দিন পর?

—ভাবলাম তোমার একটু খবরাখবর নিই। সেই যে চাকরি ছেড়ে ভাগলে... তারপর তো আমাদের ভুলেই গেছ।

অনুযোগটা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারলাম না। সরকারি গোলামিতে ইস্তফা দিয়ে তখন অধ্যাপনায় এসেছি বছর দুয়েক, পুরনো সুতোর টান ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। কেনই বা হবে না? ওই চাকরি, ওখানকার পরিবেশ, মানুষজন, কিছুই তো আমার পছন্দসই ছিল না। মানাতেই পারিনি নিজেকে। ছুঁচো গেলার মতো কাটিয়েছি সাত-সাতটা বছর। সারাক্ষণ মনে

www.boiRboi.blogspot.com

হত বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ ঘিরে আছে আমাকে। ভয়ে ভয়ে থাকতাম, এই বুঝি আমার গা থেকেও গন্ধটা বেরোতে শুরু করল। এত কুৎসিত প্রলোভন চতুর্দিকে! কাঁচা টাকার এত নির্লজ্জ ছড়াছড়ি! শিলিগুড়ি বর্ধমানের পর হাওড়ায় থার্ড পোস্টিং-এর সময়ে কলেজের কাজটা পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। তবে হ্যাঁ, দৈত্যকুলে দুটো-চারটে প্রহ্লাদও তো থাকে, তারাই মাঝেমধ্যে ফোনটোন করত, গল্পটল্প হত, দফতরের হালহকিকত জানতে পারতাম অল্পবিস্তর। তা অরিন্দম চৌধুরী মোটেই ওই প্রহ্লাদ গোষ্ঠীর নয়। তাকে বরং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বলাই ভাল। কেন তার সঙ্গে টিকিয়ে রাখব সম্পর্ক?

আলগা ভাবে বললাম,—সময় পাই না, দাদা। সরকারি নোকরি করতে করতে নিজের সাবজেক্টটা তো প্রায় ভুলতে বসেছিলাম... তাই আপ-টু-ডেট হওয়ার জন্য একটু বেশিই পড়াশুনো করতে হচ্ছে। প্লাস কলেজ যাতায়াত, ক্লাস, এগজাম, ইনভিজিলেশান, আরও নানান রকম রেসপন্সিবিলিট...

—সাবাশ! তুমি তো দেখছি একই রকম আছ হে! ঘোরতর সিরিয়াস! মাস্টারিতে ঢুকেও বখে যাওনি!

—মানে?

—মাস্টার মানেই তো সব ফাঁকিবাজ নাম্বার ওয়ান।

অন্য পেশার লোকদের কটুকাটব্য করাটাই অরিন্দমদার স্বভাব। সকলকেই নিজের আয়নায় দেখলে যা হয় আর কী। আপ বুরা, তো জগৎ ভি বুরা।

মুখ ফসকে খোঁচাটা বেরিয়েই গেল,—আপনার বাবাও কি স্কুলটিচার ছিলেন অরিন্দমদা।

—আমার বাবার কথা বাদ দাও। হি ওয়াজ এ বুরবক। চিরটাকাল নীতি আর আদর্শের বুলি কপচে কপচে নিজের বউ ছেলেমেয়ের পেটে লাথি মেরে গেছে। তাছাড়া তখনকার কাল, আর এখনকার কাল! এখন তো মাস্টাররা আর নিকিরি নেই, দিব্যি শাঁসেজলে টসটস করছে। ফ্যাট স্যালারি,

অথচ ক্লাসটাস নেওয়ার বালাই নেই। নিজের গোয়ালে গরু ঢোকাচ্ছে আর প্রাণের সুখে দুয়ে যাচ্ছে। অরিন্দম চৌধুরী হ্যা হ্যা হাসল,—যা গে যাক, যে জন্য ফোন করা। আমার ছেলেটার দায়িত্ব আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিতে চাই।

—কী দায়িত্ব? আকাশ থেকে পড়লাম,—কীসের দায়িত্ব?

—জানোই তো, রনিকে আমি ছোট থেকে বেস্ট পসিবল্ স্কুলে পড়িয়েছি। শিলিগুড়ি থেকে এসে ওকে এখানে সেন্ট অগাস্টিনে ভর্তি করে দিলাম। বহুৎ খরচার স্কুল। এক লাখ ডোনেশান, মাস মাস তিন হাজার টিউশ্যন ফি। প্লাস, আজ এই দাও, কাল ওই দাও...। সেকেন্ডারি এগজামের আগে ছ'-খানা টিউটর রেখেছিলাম। তাও রনির সেকেন্ডেরির রেজাল্টটা তেমন জুতের হল না। স্টার মার্কস পেয়েছে, কিন্তু অঙ্কের নাম্বার বেশ পুওর। ম্যাথ্সের যে টিউটরটাকে রেখেছিলাম, সে শালা শুধু অঙ্ক গিলিয়ে গেছে, কিস্যু বোঝায়নি। তাই ভাবছিলাম, এবার ইলেভেন থেকে তুমিই রনিকে অঙ্কটা দেখাও।

—আমি?

—হোয়াই নট? তোমার মতো একজন সিনসিয়ার প্রফেসারই আমার দরকার। যাতে রনির অঙ্কের বেস্টা বেশ পোক্ত হয়। ওকে জয়েন্টে বসাব তো।

—কি... আমি তো প্রাইভেট পড়াই না, অরিন্দমদা। তবে যখন বলছেন, পাঠিয়ে দেবেন বাড়িতে। দেখিয়ে দেব।

—না না, অনুগ্রহ-ফনুগ্রহ আমার চাই না। উইকে দুটো দিন তুমি ভাল করে পড়াও। আই উইল পে ইউ। যা চাইবে। এনি অ্যামাউন্ট। থাইজেন্ড, দেড় হাজার, দু হাজার....।

একেই বলে টাকার গরমে ধরাকে সরা জ্ঞান করা। কাকে কী বলছে, সে বোধটুকুও নেই। বিরক্তি গিলে নিয়ে ঠান্ডা গলায় বললাম,—সরি অরিন্দমদা। টাকা নিয়ে আমি পড়াব না। এটা আমার প্রিন্সিপল্।

www.boiRboi.blogspot.com

একটু বুঝি থমকেছে অরিন্দম চৌধুরী। দু'এক সেকেন্ড সাড়াশব্দ নেই। তারপর ফের গলা বেজেছে,—অল রাইট। তুমি চেনাজানা বলেই তোমাকে আগে অফারটা দিচ্ছিলাম। এখন তাহলে অন্য কোনও পেঁপেচোরকে ধরতে হবে। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয় রে ভাই?

এমন অভব্য মন্তব্য অরিন্দম চৌধুরীর মতো একজন আদ্যন্ত অসৎ মানুষের মুখ থেকেই বুঝি বেরোতে পারে। ঠান্ডা গলাতেই বললাম,—সেই ভাল অরিন্দমদা। টাকা যখন আছে, আপনার কীসের ভাবনা!

—স্বরটা যেন কেমন কেমন শোনাচ্ছে! মানে লেগে গেল নাকি?

—না না, আপনি তো আপনার ভাষাতেই কথা বলবেন। নয় কী? ...তরপর বলুন, আছেন কেমন?

—ফার্স্ট ক্লাস। মুরগি ধরছি, জবাই করছি, রক্ত পর্যন্ত মাটিতে পড়তে দিচ্ছি না, চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছি। হা হা হা।

—দেখবেন দাদা, রয়েসয়ে খাবেন। বয়স হচ্ছে তো, দুম করে বদহজম না হয়ে যায়।

—নো চান্স। আমার হল গিয়ে রাবণের প্লেট। জলহস্তীর হা। আস্ত দুনিয়াটাকেই আমি গিলে খেতে পারি।

—জানি তো। তবু... সাবধানের মার নেই।

—জ্ঞান মারার অভ্যেসটাও তোমার এখনও রয়েই গেছে, অ্যাঁ? আরে ভায়া, তুমি তো তিন-তিনটে বছর আমায় খুব কাছ থেকে দেখেছ। ভাল ভাবেই জানো, কত শালা কত রকম ভাবে আমার পেছনে লেগেছে, আমার একগাছি ইয়েও ছিঁড়তে পেরেছে কেউ? এই তো, নতুন সেক্রেটারি খচড়ামি করে আমায় মাথাভাঙা পাঠানোর প্ল্যান করেছিল... ট্রান্সফার লিস্ট রেডি... অর্ডার বেরনোর আগে দিলাম জল ঢেলে। সেক্রেটারির বাপই ঢালল। মন্ত্রী স্বয়ং। আমার কিছু এক্সট্রা গুঁড়ো খসল, এই যা। অবশ্য তা পুষিয়েও গেছে। তিন মাসে পাঁচগুণ উশুল করে নিয়েছি। ভাবছি, এবার একদিন সেক্রেটারির চেম্বারে গিয়ে, জাঙ্গিয়া পরে, বেলিডান্স দেখিয়ে আসব।

লোকটা সব পারে। আমার সাত বছরের সরকারি চাকরিতে এমন বেপরোয়া ঘুষখোর আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। শুধু খেয়েই সন্তুষ্ট নয়, ভোজন বৃত্তান্ত সাড়ম্বরে ঘোষাণাও করা চাই। সরকারি শুল্ক আদায় করতে গিয়ে ক্লায়েন্টদের যে কী যন্ত্রণা দিতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। টাকা চাই, প্রমোদ চাই, সঙ্গে অকথ্য ব্যবহারও চলবে। মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করে না কখনও। শিলিগুড়ি থাকার সময়ে স্বচক্ষে দেখেছি, উল্টোদিকের চেয়ারে বসা লোকগুলোকে কী ভাবে হেনস্থা করত। কেউ হয়তো আমার উপস্থিতির কারণে সংকুচিত বোধ করছে, খাম বাড়াচ্ছে গোপনে... সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমদার ধমক, হাফগেরস্তপনা করছেন কেন? টাকা টেবিলে রাখুন, বান্ডিল থেকে ক'টা নোট সরিয়ে রেখেছেন দেখে নিই! অপমানে পার্টির মুখ পলকে পাংশু, আর অরিন্দমদা খ্যাকখ্যাক হাসছে। একদিন তো এক স্যুটেড বুটেড কায়দা করে মুখের ওপর সিগারেট ধরিয়েছিল বলে তাকে অশ্রাব্য ভাষায় ঝাড়ল, তারপর লোকটাকে দিয়েই বিদেশি সিগারেট আনাল পাঁচ প্যাকেট। অবশ্যই লোকটার পয়সায়। দৃশ্যগুলোর স্থূলত্বে কেমন গা কিশকিশ করে।

সামান্য ব্যঙ্গের সুরে বললাম,—যান তবে, নাচটা দেখিয়েই আসুন। সেক্রেটারি মশাইয়ের চিত্তবিনোদন হবে।

—চিত্তবিনোদন! বেড়ে বলেছ তো! তোমার এই রসবোধের জন্যই বোধহয় তোমার বউদি এখনও তোমার নাম করে।

—তাই বুঝি? তা বউদি এখন আছেন কেমন?

—খাসা। খাচ্ছেদাচ্ছে মোটাচ্ছে, আর দিবারাত্র ছেলে ছেলে করছে।

—আর মাসিমা?

—আছে। মা বউ ছেলে, কারওই তো আমি সুখের কমতি রাখিনি। এসো না একদিন। তোমার সঙ্গে দেখা হলে ওরা খুশি হবে। শিলিগুড়ির পর থেকে ওদের সঙ্গে তো তোমার দেখাই হয়নি।

অরিন্দম চৌধুরী যেমনই হোক, তার মা বউ-এর সঙ্গে শিলিগুড়িতে

www.boiRboi.blogspot.com

খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বটে। আমার ব্যাচেলার জীবনে তারা আমার যথেষ্ট দেখভাল করেছে। ফি হপ্তায় নেমন্তন্ন, মাঝেমধ্যেই খাবার পাঠানো...। সেই কৃতজ্ঞতার জন্যই বোধহয় মুখের ওপর না বলা যায় না। মাথা নেড়ে বললাম, —হুঁ। যাব একদিন।

মানসী কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। টেলিফোন রাখতেই তার চোখে মার্জারীর কৌতূহল। অরিন্দমদার প্রস্তাবটা নাকচ করেছি শুনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হল যেন। বলল,

—তোমার আবার বেশি বাড়াবাড়ি। পড়ালেই পারতে ছেলেটাকে।

বিস্মিত মুখে বললাম, —তা হয় নাকি? জানো না, আইনে নিষেধ আছে?

—হুঁহ্, সবাই যেন আইন মেনে উল্টে যাচ্ছে! তাছাড়া তোমার কলেজ তো নৈহাটিতে। টালিগঞ্জে বসে একটা-দুটো ছাত্র পড়ালে কে দেখতে আসছে?

—বাজে বোকো না। বিবেক বলেও তো একটা কথা আছে।

—আছে। তোমার মতো ভিতুর ডিমদের ডিকশনারিতে। আরে বাবা, তুমি তো আর আগের অফিসের কলিগদের মতো ফোকটে রোজগার করবে না, খেটে কামাবে। মানসী চোখ পিটপিট করল,—পার মান্থ দু'হাজার। মানে বছরে চব্বিশ। কতটুকু মাত্র পরিশ্রমে দিব্যি একটা কুলু মানালি ট্যুর হয়ে যায়।

হেসে ফেললাম। তর্জনী তুলে বললাম,—লোভ দেখিও না, নারী। শেষে রক্ত ধুতে ধুতে হাত ক্ষয়ে যাবে, বুঝেছ?

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্ত্রের বচন। কথাটা মানসী না মানলেও আমি খুব মানি। যদিও চারপাশের পৃথিবীতে তেমন ঘটতে দেখি না বড় একটা। কিন্তু অরিন্দমদার বেলায় হঠাৎই কী করে যেন ফলে গেল শাস্ত্রের বচন। লোভের কারণে মৃত্যু না হোক, বেশ একটা বড়সড় গাড্ডায় পড়ে গেল অরিন্দম চৌধুরী। ধরা পড়ল ভিজিলেন্সের হাতে। নিজের অফিসে।

নিউজপেপারে আচমকা খবরটা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম কি? উঁহু।

পুলকিত? তাও তো নয়। ব্যথিত? প্রশ্নই আসে না। শুধু একটা জিজ্ঞাসা ঘুরপাক খেতে থাকল মাথায়। যে লোকটার উৎকোচ গ্রহণের কদাচ কোনও লুকোছাপা নেই, উনিশ বছর ধরে দাপটে নিজের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ সে পাকড়াও হয় কী করে? অরিন্দমদা বলেছিল বটে নতুন সেক্রেটারি তার পিছনে লেগেছে, এ কি তবে তারই নাড়া কলকাঠি?

সেদিন কলেজ বেরনোর তাড়া ছিল, কৌতূহলটাকে ধামাচাপা দিতে হল তখনকার মতো। পরদিন প্রাক্তন এক সহকর্মীকে রিং করলাম,—অতনু, কেসটা কী গো?

অতনুর স্বরে যেন চাপা উচ্ছ্বাস,—কী আবার বাড়াবাড়ির পরিণাম।

—বাড়াবাড়ি করাটা কি অরিন্দমদার নতুন?

—তা নয়। তবে ইদানীং বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে বাড়াবাড়ি করছিল। পুজোর পর হুট করে রেট ডবল করে দিল, দিতে রাজি না হওয়ায় অকারণে ফাঁসাল তিনটে পার্টিকে, ধড়াধ্ধড় পেপার সিজ করছে... ধর্মের কল কদ্দিন আর না নড়ে থাকবে?

—কিন্তু নাড়ালটা কে? তোমাদের ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি?

—যতদূর জানি, না।

—তবে?

—অরিন্দম চৌধুরীর কি শত্রুর অভাব? ভিজিলেন্স তো বহুকাল ধরে থাবা চাটছে, ইনকাম ট্যাক্সেরও নজর ছিল...। মিনিস্ট্রিতে খুব হোল্ড তো, কেউ তাই এত দিন ট্যা-ফো করতে পারছিল না। কর্ণের রথের চাকা এখন বসে গেছে। এবার সবাই মিলে ওকে পিষবে।

—কর্ণের রথ... চাকা....?

—বুঝলে না? অরিন্দমদার বিপদকালের ত্রাণকর্তা। যার অভয়মুদ্রার জোরে বাবুর এত লপচপানি।

—মিনিস্টার?

—শনিঠাকুরও বলতে পারো। যার থানে নিয়ম করে প্রসাদ চড়ায়

www.boiRboi.blogspot.com

অরিন্দমকুমার। কি এবার হয়ে গেছে বুমেরাং কেস। ঠাকুর ডিজওউন করেছে ভক্তকে।

—কেন?

—দেবরাজ ইন্দ্রের চাপে। যে পার্টিটা নালিশ ঠুকেছিল, তারও নাকি খুব লম্বা হাত। সরকারের বড় তরফে ভাল জানপহেচান।... লোকটা অবশ্য একদম সেটা বুঝতে দেয়নি। সুতো ছাড়ছে, সুতো ছাড়ছে... ফাইভ স্টারে খানাপিনা, রেসের মাঠ...। তারপরও যখন বাবু এক পয়সা রেট কমাতে রাজি হল না, তখনই খেলাটা দেখাল। পলিটিকাল মাথাদের ধরে, আলিমুদ্দিনের গ্রিন সিগনাল নিয়ে, আট ঘাট বেঁধে, ক্যাচ কট কট। এবার ঠেলা বোঝো চাঁদু, আমরক্ত হাগো।

অরিন্দম চৌধুরীর ওপর মায়া জাগার কোনও কারণ নেই, তবু কেন যেন খারাপ লাগছিল। অতনুর টিপ্পনীগুলো কেমন টেকছিল কানে। হাজার হোক, ভদ্রলোকের ছেলে, সংসারী মানুষ...!

জিজ্ঞেস করলাম, —বেল পেয়েছে?

—উঁহু। এখন এক সপ্তাহ পুলিশ কাস্টডি। থানায় ছেঁচবে। ওই দাপুটে লোকটা যা হিউমিলিয়েটেড হচ্ছে না! শুনলাম তো ধরার পরেই কোমরে দড়ি বেঁধে নাকি নতুন বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। ভাবো, নয়া পড়শিদের সামনে কী চরম হেনস্থা!

—অরিন্দমদা নতুন বাড়ি করেছে নাকি? কোথায়?

—বাড়ি বলো না, আলিশান প্রাসাদ। সল্টলেকে। আগাগোড়া মার্বেলে মোড়া। গৃহপ্রবেশে যাদের ডেকেছিল, তাদের মুখে শুনেছি বাথরুমগুলোও নাকি চোখ ধাঁধানো। ফ্রস্টেড গ্লাসের নকশাদার ফলস সিলিং, জাকুজি বাথ, কেতার ওয়াশ এরিয়া, কালার টিভি, কী নেই! ভিজিলেন্স এবার ইঞ্চি মেপে মেপে হিসেব নেবে।

অতনুর সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ করে চুপচাপ বসে রইলাম খনিকক্ষণ।

ভাবছিলাম মদগর্বী মানুষটার কথা। অরিন্দমদা নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েছে! হাজতে বসে কী ভাবছে এখন? কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে কী?

রাতে খাবার টেবিলে অরিন্দমদাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল। মানসী খুব একটা বিচলিত নয়। মাছের কাঁটা চিবোতে চিবোতে বলল,—দেখে নিও, তোমাদের অরিন্দম চৌধুরীর কিস্যু হবে না।

বললাম,—না গো, অরিন্দমদা গেছে। ঘুষের বান্ডিলে সই মেরে দিয়েছিল পার্টি, অরিন্দমদার বাঁচার কোনও উপায়ই নেই।

—ছাড়ো তো। ঠিক ঠিক জায়গায় বাতাসা ছড়াতে পারলে আস্ত নোটের বান্ডিলটিই হয়তো বদলে যাবে। ঘুষটুষ খাওয়া এখন আর কোনও অপরাধ নয়। এটা হল কাট্‌মানির যুগ।

চার বছরের বুবলি হাঁ করে আমাদের কথা গিলছিল, ইশারায় থামতে বললাম মানসীকে। মানসী পাত্তা দিল না, শ্লেষের সুরে বলল,—আমরা মুখে কুলুপ আঁটলে কি দুনিয়াটা বুবলির অজানা থাকবে? বড় হয়ে যে-যার মনোমতো রাস্তা ঠিক খুঁজে নেবে। তোমার অরিন্দমদার বাবা তো নাকি খুব আইডিয়ালিস্ট ধরনের মানুষ ছিলেন, নিশ্চয়ই ছেলেকে নীতিশিক্ষাও কম দেননি, তাও তাঁর পুত্রটি কী করে এমন হল, অ্যাঁ?

জবাব দিতে পারলাম না। কারণটা তো আমিও খুঁজছি।

মেয়েদের দূরদর্শিতার ওপর কোনও কালেই আমার শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু মানসী আমাকে চমকে দিল। আশ্চর্য ভাবে মিলে গেল তার ভবিষ্যদ্বাণী।

বছর দুয়েক পরের কথা। কলেজফেরতা শেয়ালদায় নেমে মির্জাপুর বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা গাড়ি সামনে এসে থেমেছে। প্রায় গায়ের ওপর। জানলায় পরিচিত মুখ। শেষ দেখেছি বছর পাঁচেক আগে, তবে চিনতে সময় লাগে না। অরিন্দমদা! অরিন্দম চৌধুরী!

গলা বাড়িয়ে অরিন্দমদা বলল, —যাচ্ছ কোথায়?

নাটকীয় সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। থতমত খাওয়া মুখে বললাম,—গৌরীবাড়ি।

—তুমি টালিগঞ্জের দিকে থাকতে না?

—শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। বউ মেয়ে এখন ওখানে।

—চলে এসো গাড়িতে। তোমায় একটা লিফট দিয়ে দিই।

ইতস্তত করলাম, —আপনি তো সল্টলেক... কেন মিছিমিছি ঘুরতে যাবেন!

—তো কী! তেল থোড়াই আমার পুড়বে! ওঠো ওঠো, উঠে পড়ো।

প্রায় জোর করেই আমায় গাড়িতে তুলে নিল অরিন্দমদা। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বসেছি। খানিক জড়োসড়ো হয়ে। ব্যাপারখানা কী? অরিন্দমদার মুখে তো সামান্যতম উদ্বেগের চিহ্ন নেই? দিব্যি গাড়ি চড়ে ঘুরছে, চেহারাও যথেষ্ট চকচকে। ভুঁড়ির মেদ বৃদ্ধি পেয়েছে দস্তুর মতো। চোখের কোলে মদ্যপান জনিত ফোলা ভাব যথেষ্ট প্রকট। দু'বছর ধরে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া মানুষকে তো এতটা টগবগে দেখানোর কথা নয়! মাস চারেক আগেও শুনেছিলাম, অরিন্দম চৌধুরীর বিরুদ্ধে নাকি চার্জশিট তৈরি, মামলা শুরু হল বলে।

অরিন্দমদাই বাতচিৎ আরম্ভ করল,—কী হে পেঁপেচোর, ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বনাশ করা কেমন চলছে?

সেই পুরনো সুর! ধন্ধ মাখা গলায় বললাম, —চলছে। ...আপনি কেমন আছেন?

—ফার্স্ট ক্লাস। মুরগি ধরছি, জবাই করছি, রক্তটুকুও পড়তে দিচ্ছি না, চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছি। চিরাচরিত লব্‌জটা আউড়ে হা হা হেসে উঠল অরিন্দমদা। টেরচা চোখে আমায় দেখে নিয়ে বলল, —কী ভাবছ, অ্যাঁ?

...না... মানে...। ঢোঁক গিললাম,—শুনেছিলাম আপনি নাকি... কী সব যেন ঝামেলায়...?

—আহা, বলতে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? দুনিয়াসুদ্ধু লোক তো কাগজে দেখেছে। ...হ্যাঁ, সাসপেন্ড হয়ে ছিলাম। বাট বাই দা গ্রেস অব ডেভিল, আবার এসেছি ফিরিয়া। এই মাস দুয়েক হল জয়েন করেছি।

www.boiRboi.blogspot.com

অবাক গলায় বললাম,—কিন্তু কেস নাকি কোর্টে...?

—চলছে। চলবে। ভিজিলেন্স একটা চোথা সাবমিট করেছে। আমিও একটা খচ্চর উকিল ফিট করেছি। সে এখন অবিরাম ডেট নিয়ে যাবে। চলুক তো এ ভাবে কিছু দিন।

—কিন্তু... মামলা চললে সাসপেনশান উইথড্র হয়?

—ওপরওয়ালার করুণা জাগলে কী না হয়। অরিন্দমদা অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ টিপল,—প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে হে। বড় তরফের বড় হাঁ বন্ধ করেছি, আমার নাড়ুগোপাল মন্ত্রীকে গুজিয়া সন্দেশ খাইয়েছি, তার চ্যালচামুণ্ডাদেরও কম সেবা করিনি...! শুধু সেক্রেটারিটাই যা জাবপাত্রে ভোঁউ ভোঁউ করছিল। তা তাকে শেষমেশ মন্ত্রী কী নোট পাঠিয়েছে, জানো? সাসপেন্ড হওয়া কর্মচারীকে মাইনের একটা মোটা অংশ দিতে হয় মাস মাস, উইদাউট টেকিং এনি সার্ভিস ফ্রম হিম। এ এক ধরনের সরকারি অপচয়। সুতরাং মামলা যেমন চলছে চলুক, কর্মচারীটিকেও শর্ত সাপেক্ষে পুনর্বহাল করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া হোক। কী বুঝলে?

হেসে ফেললাম,—আপনি মাইরি গুরুদেব লোক। আপনার পিতৃদত্ত নামটি সার্থক। আপনি অরিদের দমন করে ছেড়েছেন।

—হ্যাঁ, বাবা ওই একটা কাজই যা ঠিকঠাক করতে পেরেছিল। বাকি সবটাই তো শূন্যগর্ভ। ছেঁড়াফাটা জামা পরিয়ে শুধু জ্ঞান মেরে যেত! অভাব অনটনকে গ্রাহ্য কোরো না! মনে রেখো, সততাই জীবনের মূলধন! যত্ত সব ফাঁকা ফাঁপা বুলি! আরে ভাই, দু'দিনের জন্য পৃথিবীতে এসেছি, দু'দিন বাদে ফুটে যাব... মাঝের ক'টা দিন পৃথিবীটাকে যদি দেড়েমুশে ভোগই না করলাম, তাহলে আর জন্মে লাভ কী? অথচ আমার পিতাশ্রী...

লাগাতার পিতৃনিন্দা চলেছে। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। মুখ ফেরালাম জানলার বাইরে। রাজাবাজারে আটকে আছে গাড়ি। যানজট। অরিন্দমদাকে থামানোর জন্যই বলে উঠলাম,—উফ্, শহরটা দিন দিন অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। একে এই ভাদুরে গুমোট, তার ওপর কাতারে কাতরে মানুষ, গাড়ি, বাস, অটোরা, ধুলো, ধোঁয়া....!

www.boiRboi.blogspot.com

—ইশ্, কষ্ট হচ্ছে তো! আমারই দোষ। কাংকারিয়া এসি গাড়িই পাঠাবে বলেছিল, গলাটা খুসখুস করছে বলে আমিই বারণ করে দিলাম।

—নো প্রবলেম। বাসট্রামের লোক আমি, এসব কষ্ট তো আমার গা সওয়া। অরিন্দমদার দিকে ঘুরে বসলাম, —আপনার বাড়ির খবর কী? সব ঠিকঠাক?

—চলছে। ...রনি তো জয়েন্টে বসল না। সায়েন্সে ফার্স্ট ডিভিশানই পেয়েছে, কিন্তু ভর্তি হল ইংলিশ নিয়ে। ইচ্ছে। তোমার বউদিও দেখলাম তালে তাল দিল। ...যা খুশি করুক, আমি আর অত ভাবতে পারি না।

চাপা একটা ক্ষোভ যেন উঁকি দিয়ে গেল অরিন্দমদার স্বরে। ছেলের জেদের কাছে হার মানতে হয়েছে বলে কী?

আলাদা ভাবে বললাম, —ইংলিশ অনার্সেও ভাল প্রসপেক্ট আছে।

—ছেলের প্রসপেক্টের আমি তোয়াক্কা করি নাকি? সে কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে থোড়া ভাবি! যা রেখে যাব, ওর লাইফটা ড্যাংডেঙিয়ে কেটে যাবে। তবে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হলে পাঁচজনের কাছে একটু ভাও নিতে পারতাম, এই যা।

আদর্শ বাপের উপযুক্ত সংলাপ! মাথাটা অল্প ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললাম, —আর মাসিমার শরীর কেমন?

—বলতে পারব না। মা আমার আমার কাছে থাকে না।

—সে কী? কেন?

—তার মান গেছে। মুখে চুনকালি পড়েছে। যেদিন বেল পেয়ে বাড়ি ফিরলাম, সেদিনই তিনি গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে। আগেই যেতে পারত, আমাকে দেখিয়ে গৃহত্যাগ করবে বলে ওয়েট করছিল।

—চলেই গেলেন? এই বয়সে...? কোথায় গেলেন?

—সোদপুরের এক বৃদ্ধাশ্রমে। তার মেয়ে জামাই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখার ধক নেই, তবু ফুসলিয়ে নিয়ে গেল

বুড়িকে। অফার দিলাম, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দিচ্ছি। শুনলই না। সে আর আমার পাপের টাকা ছোঁবে না, আমার মুখদর্শন পর্যন্ত করবে না! এত কাল যেন ঘুমোচ্ছিল, জানতই না শুধু মাইনের পয়সায় অত আমিরি হয় না! অরিন্দমদা গরগর করে উঠল,—কী চমৎকার একটা মহল বানিয়ে দিয়েছিলাম মাইরি! দক্ষিণ খোলা ঘর, চব্বিশ ঘন্টা হু হু বাতাস বইছে, সামনে চওড়া একখানা ব্যালকনি... আলাদা টিভি, মার্বেলের বিশাল ঠাকুরঘর... বাথরুমে কমোড গিজার...। বুড়ো বয়সে আর কী চাই? প্রেমসে থাকো, ধম্মোকম্মো করো... বর তো কিস্যু দিতে পারেনি, ছেলের কল্যাণে একটু সুখভোগ করো। সইল না। তেজ দেখিয়ে চলে গেল।...আমিও দেখছি, কত দিন বুড়িদের খোঁয়াড়ে গাদাগাদি করে থাকতে পারে! দিদিই বা কদ্দিন উইডো পেনশানে ভর্তুকি দেয়! এই পাপিষ্ঠ সন্তানের কাছেই ঘাড় ঝুলিয়ে ফিরতে হবে। আরামের যে অভ্যাসটি তৈরি করে দিয়েছি, সেটি যাবে কোথায়, অ্যাঁ?

মুখে আর শব্দ ফুটছিল না। স্থির দৃষ্টিতে অরিন্দম চৌধুরীকে দেখছিলাম। লোকটা বোধহয় পুরোপুরি মানুষ নয়। অহংসর্বস্ব, দু' কান কাটা এক জঘন্য লোভী জীব মাত্র।

গাড়ি কখন যেন চলতে শুরু কলেছিল। গড়াতে গড়াতে পৌঁছে গেছে গৌরীবাড়ি। শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম। অরিন্দম চৌধুরী হাত নাড়ল,—যাও শ্বশুরের কিছু অন্ন ধসাও গিয়ে। তুমি তো কনট্যাক্ট রাখবে না, এভাবেই হয়তো কোনও দিন দেখা হয়ে যাবে পথেঘাটে।

জোর করে একটা হাসি টানলাম মুখে। মনে মনে বললাম, —রক্ষে করো। ওই শ্রীমুখ যেন আর কখনও দেখতে না হয়।

লোকটাকে ঝেড়েই ফেলেছিলাম মন থেকে। আগের অফিসের সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্কটুকুও ছিঁড়ে গেছে ক্রমশ। কলেজে এখন আমার অনেক বন্ধুবান্ধব, পুরনো সহকর্মীরা এখন ধূসর স্মৃতি। সংসার নিয়েও ভারী ব্যস্ত থাকতে হয় আজকাল। বুবলি লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হচ্ছে, তার পিছনেও সময় দিতে

www.boiRboi.blogspot.com

হয় খানিকটা। মানসীর ইচ্ছেমাফিক একখানা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছি ব্যারাকপুরে। লোনটোন নিয়ে মাথার ওপর ছাদ করতে গিয়ে আমার প্রায় পাগল পাগল দশা।

গত সপ্তাহে একবার বিকাশ ভবনে গিয়েছিলাম। পে কমিশনের এরিয়ার বিলগুলোর খোঁজখবর করতে। সাত বছর পরেও বকেয়া টাকার অনেকটাই পাওনা আছে, শুনছিলাম এবার নাকি ভোটের আগে ছাড়বে দয়ালু গভর্ণমেন্ট।

উঁচু বিল্ডিংটা থেকে সবে বেরিয়েছি, হঠাৎই সামনে অরিন্দম চৌধুরী। প্রায় মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল যেন। সটান ঘাড়ে হাত রেখে বলল,—কী হে, এদিকে কোথায়?

লোকটাকে দেখে মোটেই প্রীত হইনি। তবু ভদ্রতার খাতিরে কথা তো বলতেই হয়। কেঠো হেসে বললাম,—ডি-পি-আই অফিসে একটু দরকার ছিল।

—কাজ হল?

—নাহ্। যার কাছে ফাইল, সে কী সব দাবিদাওয়া নিয়ে ডেপুটেশান দিতে যাবে। আজ টেবিলে সে বসবেই না।

—দ্যাখো। নিজেই দ্যাখো। অরিন্দম চৌধুরী চোখ ঘোরাল,—যারা কাজ করতে চায় না, সরকার তাদের জামাই আদরে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছে। আর যে কাজের জন্য ছটফট করে, তার অফিসেই ঢোকা মানা। এটাই বোধহয় গভর্ণমেন্টের পলিসি।

অরিন্দম চৌধুরীরর বক্তব্যটা কী? চোখ কুঁচকে তাকালাম।

—বুঝলে না? আবার সাসপেন্ড হয়েছি।

—অ্যাঁ?

—অ্যাঁ নয় ভাই, হ্যাঁ। অথচ আমিই ডিপার্টমেন্টকে সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ তুলে দিই। অরিন্দম চৌধুরী ঠোঁট উল্টোল, —গাড়লরা বোঝ না, যারা মাল্লু খায়, কাজ তারাই বেশি করে। সরকারের ঝাঁপি তারাই ভরায়।

আবার সেই চিরাচরিত বাগাড়ম্বর। কেটে পড়ার তাল করছিলাম, অরিন্দমবাবু সুযোগই দিলেন না,—কেন সাসপেন্ড হয়েছি জিজ্ঞেস করলে না?

জানার আমার কণামাত্র আগ্রহ নেই। তবু প্রশ্ন করতেই হল,—কেন?

—এখানে দাঁড়িয়ে শুনবে? এদিক-ওদিক তাকাল লোকটা,—চলো না, কাছেই তো আমার বাড়ি... বাড়িটাও দেখা হবে...

কোনও ওজর আপত্তি খাটল না। আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল অরিন্দমদা। যেতে যেতে ওগরাচ্ছে মহাভারত। তাকে আগের বার চাকরিতে ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে সেক্রেটারির সঙ্গে কতটা ক্যাচাল বেধেছিল মন্ত্রীর, এঁটে উঠতে না পেরে সেক্রেটারি কী কী বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছিল, পরের সেক্রেটারি জয়েন করেই কী ভাবে কাঠিবাজির ব্যাটনটা হাতে তুলে নিয়েছে, কত সামান্য একটা কারণে অরিন্দম চৌধুরীকে শোকজ ছুঁইয়েই আবার সাসপেনশানের চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হল, কেন এই অর্ডার ধোপে টিকতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

করব না, করব না করেও একটা প্রশ্ন করেই ফেললাম,—আপনার সেই কেসটার কী হল?

—লোয়ার কোর্টে একটা মাইনর কন্‌ভিকশান হয়েছে। ছ'মাস জেল। আমি হাইকোর্টে মুভ করেছি। জাজমেন্টে ইয়া ইয়া ফাঁক আছে। হাইকোর্ট ওই অর্ডার বাতিল হয়ে যাবে। অরিন্দমদা চোখ টিপল,—হাইকোর্টের ন্যায়াধীশরা দেবতা-সমান। পরিমাণ মতো নৈবেদ্য চড়ালে ক'টা দেবতা ভক্তের ওপর প্রসন্ন না হয়ে পারেন ভাই?

কথায় কথায় বাড়ি এসে গেছে। অতনু ঠিকই বলেছিল, বাড়ি নয়, প্রাসাদ। দু-চার সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন হীনমন্যতা জাগে।

কারুকাজ করা লোহার গেট ঠেলে ঢুকল অরিন্দমদা। ডাকল,—এসো।

যত্নলালিত খুদে বাগান পেরিয়ে গোল বারান্দা। বারান্দায় উঠলে প্রকাণ্ড কাচের দরজার ওপারে ড্রয়িংরুম। আগাগোড়া কার্পেট মোড়া।

www.boiRboi.blogspot.com

সোফায় বসে ঘরটাকে নিরীক্ষণ করছিলাম। মাথার ওপর দু'খানা ফ্যান, দেওয়ালে স্প্লিট এসি। ঘরখানা সাজানোও হয়েছে যথেষ্ট খরচাপাতি করে। দেওয়ালের রং, পেন্টিং, আসবাব, পর্দা, ল্যাম্পশেড, শো-পিস, সবেতেই রীতিমতো রুচির ছাপ। কে সাজিয়েছে? বউদি?

অরিন্দমদা অন্দরে গিয়েছিল। ফিরে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে, —কেমন দেখছ?

—চমৎকার।

—ইন্টিরিয়ার ডেকরেটর দিয়ে সাজিয়েছিলাম। আরও কিছু জিনিস ছিল এ ঘরে। ও পাশের দেওয়ালে একখানা বড় স্ক্রিনের টিভি ছিল, ব্যাটারা সেবার সিজ করে নিয়ে গেছে। ওটা নাকি হিসাববহির্ভূত অ্যাসেট! হা হা হা।

একটা মাঝবয়সি লোক ট্রেতে দু'গ্লাস সবজেটে শরবত এনে রাখল টেবিলে। অরিন্দমদা সামনে বসতে বসতে বলল,—খেয়ে নাও। ম্যাংগো পাল্‌প দিয়ে বানানো। শরীরটা ফ্রেশ লাগবে।

গ্লাস হাতে তুলে বললাম,—বউদি কি ঘুমোচ্ছেন?

—সে নেই।

—বেরিয়েছেন বুঝি? শপিং?

—না। রুমা এখন পুরুলিয়ায়। রনির সঙ্গে থাকে।

—রনি পুরুলিয়ায় কী করছে?

—তার দাদুর প্রফেশান। স্কুলমাস্টারি। গ্র্যাজুয়েশানের পরই বাবু পরীক্ষায় বসে ইচ্ছে করে ওই জায়গায় চাকরিটি জুটিয়েছেন।

—বাহ্, কাজের কাজ করেছে। ছুটিছাটায় আসবে, আপনিও যাবেন...

—না। আমার ওখানে যাওয়া নিষেধ। ওরাও আর কোনও দিন এ বাড়িতে পা রাখবে না। বলেই আচমকা ফেটে পড়েছে অরিন্দমদা, —ওদের নাকি ঘেন্না করে। রুমা নাকি পঁচিশ বছর ধরে তুষের আগুনে জ্বলেছে।

ছেলের নাকি আমাকে দেখলেই বমি পায়। মা আর ছেলে নাকি দাঁতে দাঁত চেপে প্রতীক্ষা করেছে, কবে আমার কাছ থেকে দূরে পালাতে পারবে। ...কী জাতের নেমকহারাম তুমি ভাবো! এদের সুখের জন্য আমি কী করিনি! এই তার প্রতিদান? আমিও ডিসাইড করে ফেলেছি, মরে যাই, হেজে যাই, পচে যাই, তবু ওই বেইমানদের আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেব না। থাক তোরা তোদের পেটি লোকলজ্জা নিয়ে। নীতিকথার ফেস্টুন লাগিয়ে ঘোর যেখানে খুশি। আই কেয়ার এ ফিগ্। ...এত বড় স্পর্ধা, আমার দেওয়া গয়না জামাকাপড় আমারই মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল!

অরিন্দমদার মুখ লাল হয়ে গেছে। মুঠো করা হাত দুটো কাঁপছে ঠকঠক। পঞ্চাশ পেরনো স্থূলবপু মানুষটার ফোলা ফোলা চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। নার্ভাস গলায় বললাম,—অরিন্দমদা, শান্ত হন। প্লিজ।

—নো। নো। আমি একটা একটা করে জ্বালাব। একটা একটা করে পোড়াব। অরিন্দমদা ভূতগ্রস্তের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। অদৃশ্য শত্রুর দিকে তর্জনী তুলে চিৎকার করে উঠল,—কায়দা করে কেউ আমায় কোনও দিন কব্জা করতে পারেনি। পারবেও না। আমার মা বউ ছেলে, কারও একটা চিহ্নও আমি রাখব না। এ বাড়ি যখন পাপের ইটে গাঁথা, তখন এ বাড়িতে আমি একাই...

কথা শেষ করতে পারল না অরিন্দম চৌধুরী, তার আগেই মাঝবয়সি কাজের লোকটা এসে দু'হাতে জাপটে ধরেছে তাকে। হাতের ইশারায় আমায় চলে যেতে বলল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে মোটামুটি অভ্যস্ত। এবং মাঝে মাঝেই মনিবটিকে সামাল দিতে হয়।

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম। দিনের আলো পড়ে আসছে, সূর্য এখন অনেকটাই নিস্তেজ। গেটের বাইরে এসে বাড়িটার দিকে ঘুরে তাকালম একবার। ফ্যাকাশে রোদ্দুরে কেমন যেন নিঝুম দেখাচ্ছে অরিন্দম চৌধুরীর প্রাসাদটাকে।

উঁহু, প্রাসাদ নয়। জেলখানা।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com